হাড় কাঁপানো ভূতের গল্প

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলকুমার দাস



পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

HAR KAPANO BHUTER GALPO

Edited By: Shirshendu Mukhopadhyay

&

Ujjal Kr. Das

প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৩



প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ শঙ্কর বসাক

পাত্র'জ পাবলিকেশনের পক্ষে মানস কুমার পাত্র কর্তৃক ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং রাজেন্দ্র অফসেট, ১১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

'ভূত' কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গা ছম ছম করা একটা পরিবেশ। ভূত আবার নানারকমের হয়ে থাকে। ভালো ভূত, মন্দ ভূত, উপকারী ভূত, অপকারী ভূত, ইত্যাদি। এই ভূতকে আমরা ছোট-বড় সকলেই ভয় পেয়ে থাকি। আবার অনেক ভূতের গল্প পড়লে আমাদের মনে সাহস বাড়ে।

এই রকম নানা ভূতের গল্প নিয়ে আমাদের এই বইটি 'হাড় কাঁপানো ভূতের গল্প' আশাকরি ছোট ও বড়দের সমানভাবে মন ভরাবে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বলকুমার দাস



হাড় কাঁপানো ভূতের গল্প

সূচিপত্র

জোলা আর সাত ভূত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল, চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুসি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল, 'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকে চিবিয়ে খাব!' জোলার মা বলল, 'খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?' জোলা বলল, 'খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' ব'লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট

হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!' এখন হয়েছে কি- সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের ত বড্ডই ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ, কোত্থেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কি করি বল্ ত!

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন!'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ-তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলেছে দেখেইত সে এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কী করব!'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা আমি পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েস জোলা কখনো খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যারপরনাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কি করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এ বেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে ত তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়,এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, 'বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর জিলিপি, অমৃতি, বরফি, চমচম এই সব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে তার বন্ধু ভাবল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল; কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা, বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর-একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর মাকে বলছে, 'দেখো মা, কী চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কী খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তুএ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন তো জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই ভূত ব্যাটাদের এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?'

ভূতেরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'



অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও হিহি হি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিসটি বন্ধুকে না দেখলেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু তো এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়াগায় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তর বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল; এসে দেখল যে, তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা; আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশি হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, কাতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো

মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমন বকুনি দিল যে, তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

'বেটারা আমাকে দুবার দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস-আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কি করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছে। তোদের সব কটাকে খাব!'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই তো হয়েছে! অপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় অপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' এ কথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কী হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগল এনে দেবে!' ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ ত! তা হলে দেখবেন, কি মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু তো ভাবছে না জানি কি মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল,

'লাঠি, লাগ ত! তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখে নি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটাতে পিটাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে!'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কি করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির কবলেন। জোলা হাঁড়ি হতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক তো!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি হাতি-ঘোড়া-খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার পর নাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনও ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লেকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটাতে লাগল। রাজার সেপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুঠে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কী করি বল্ ত? বেঁধেই নেবে দেখছি।'

জোলা বলল, 'আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠি বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি লাগ ত।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি-ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে। শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুঠেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশায়ের পায়ে পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে মাপ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনো খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।



মহেশের মহাযাত্রা

রাজশেখর বসু



কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আর একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনি—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, স্কন্ধকাটা—এঁনারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদ বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিসনি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানি, কেউ দোকানি, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু'দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কী হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়।'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেননি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হতে পারেনি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন, তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হলে কি হয়, দু'জনে হরদম ঝগড়া হত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না-মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকার হয়নি, দু'-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা

নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—' ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—' লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পালটা জবাব দিলেন—' লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দুশো, তাতে ইহকালের ক'টা শখই বা মিটবে। তাইতো পরকালের আশায় বসে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—' কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কী?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙ্গুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে, ছেঁড় আর খাও! জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হেথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু'দণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে তো প্রমান কর।'

তর্ক জমে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বসে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা করে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—' কেউ-উ নেই, আমি

দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কেপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর $=0$ আত্মা $=$ভূত $= \int 0$ ।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না! এ হল গিয়ে দস্তুরমতো ইণ্টিগ্রাল ক্যালকুলাশ। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার বয়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—' বেশ তো হরিনাথ, তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা আসছে হপ্তায় শিব চতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনও বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কান কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হলেই হল।'

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু'ধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছিলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল।

হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতির দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু'হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না!'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ করেই ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নিচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন ক্লাস?'

ভূত থতমতো খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেণ্ড ইয়ার সার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি সার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটা ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্‌টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়িমুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয়নি সময়?

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দু'জন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ, তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—মহেশ, তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেণ্ড করলুম। আর মহেশ, তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেণ্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশি দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়াচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসপি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পাননি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্‌কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু'ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্‌ ইত্যাদি। তার পর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের

চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আল্‌জেব্‌রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

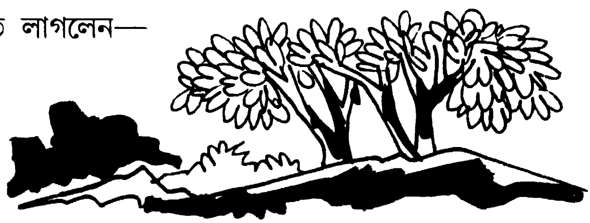
হরিনাথ কুণ্ডু
খাই তোর মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদি কবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হন, আর রবীন্দ্রনাথই হন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী একবার যদি কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—



হরিনাথ ওরে,
হবি তুই মরে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা! মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তার পর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে নিয়ে ফের লিখলেন—



ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—' সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনও লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি
ট্যাঁড়স ফলাবি।



মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন,কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল---প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশি বিলাতি বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়াতে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তু বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখ না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চটে উঠলেন। শেষটায় এমন হল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজের উপরও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ করে ঐ ভুতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগই তাঁর অসুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্‌যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয় নেই। বললেন—'হরিনাথ, তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকে অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ —খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করো না! ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু'-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের শোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হলে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।।

অনেক্ষণ পরে দু'জন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ করে বসে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ,আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক যোগাড় হল। পনেরো টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন' সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিঠমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ মরে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীর সকলেই সেই শীতে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—' ঢের ঢের বয়েছি মশাই, এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করিনি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনেরো টাকায় হবে না মশায়. আরো পাঁচ টাকা চাই। '

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু'পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিনজন হাঁপাতে হাঁপাতে টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময় হরিনাথের নজর পড়ল—কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ, আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু'-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ

মিত্তির ও বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন চল চল।

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে। তারপর ফের খাট নামাতে হল। এই যে চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন প্রহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন করে চলেছে। হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে। ছুট-ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বীডন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেল যে। লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের?' কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু

দৌড়চ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠছে না নিচে নেমেছে? একি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে...'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলস্লি স্ট্রীটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডিদাদনখাঁ-এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

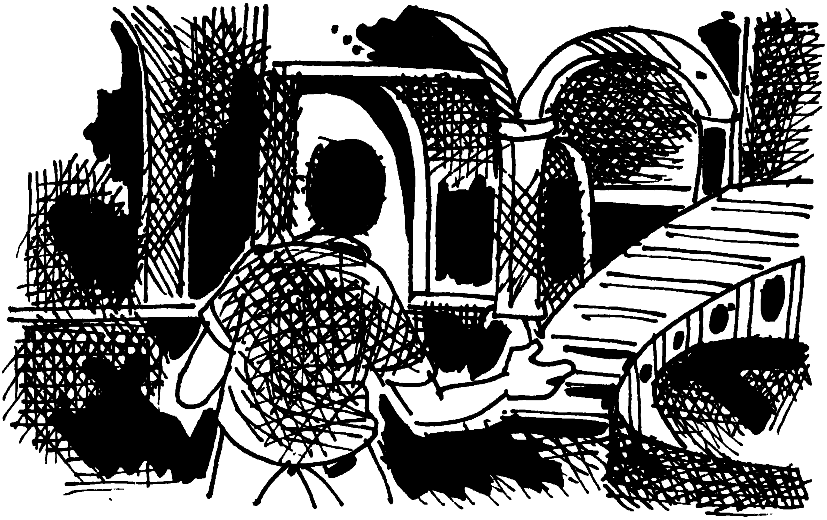
'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য! মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শুরু হল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

ভূত-পেত্নীর কথা

হেমেন্দ্রকুমার রায়



তোমাদের কাছে আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বলেছি অনেক। কিন্তু সত্যি সত্যি ভূতের অস্তিত্ব আছে কিনা, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই।

এ-সব নিয়ে দরকার নেই আমাদের মাথা ঘামিয়ে। কারুকেই আমি ভূত বিশ্বাস করতে বলি না। অন্তত ভূত মানলেও ভূতকে ভয় করবার কোনও দরকার আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ভূত মানি আর না মানি, মাঝে মাঝে এমন কতকগুলো আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যাদের কোনও মানে হয় না। সেগুলো ভূতের কীর্তি না হতে পারে, কিন্তু তাদের মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপার্থিব শক্তি কাজ করে।

প্রায় বছর-কুড়ি আগে কলকাতায় জয় মিত্র স্ট্রীটের একটি বাড়িতে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। কোথাও কিছু নেই, বন্ধ ঘরের মধ্যে হঠাৎ একরাশ ইট বা রাবিশ বৃষ্টি হল। চোখের সামনে ঘটি, বাটি ও থালা মাটি থেকে উঠে শূন্যে উড়তে লাগল পাখির মতো, তারপর ঝন্ ঝন্ করে আবার মাটির উপরে পড়ে ভেঙেচুরে গেল। থানায় খবর দেওয়া হল। পুলিশবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করে সতর্ক পাহারা দিতে লাগল, তবু ওই-সব উপদ্রব বন্ধ হল না। অথচ তার কিছুকাল পরে—পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে সরে

পড়েছে—তখন সমস্ত উৎপাত আপনা-আপনি আবার থেমে গেল! ওই উপদ্রবের কাহিনী সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয়েছিল এবং দলে দলে লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করেছিল।

আমাদের নিজেদের ভিতরে দুইবার দুটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে।

অনেক দিন আগে আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে এক বৎসর বাস করেছিলুম। পরিবারের মধ্যে বাবা, মা, আমি আর দুই বোন। পে-অফিস-লেন নামক রাস্তায় যে বাড়িখানা আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম সেখানা এখনো বর্তমান আছে কিনা জানি না, কিন্তু তখন সে-বাড়িতে সহজে কেউ থাকতে চাইত না। আমরা ভাড়া নেবার পরেই পাড়ায় লোকের মুখে খবর পাওয়া গেল, এ বাড়িতে নাকি অনেক-রকম ভয় আছে। এর মধ্যে একজন পাঠান নিহত হয়েছে এবং আর একজন পাঠান করেছে আত্মহত্যা। তারপর থেকে এখানে আর কেউ বাস করতে পারে না। বাবা কিন্তু ও-সব কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

আমার বয়স তখন অল্প। সব কথা ভাল করে মনে হয় না, তবে কোনও কোনও ঘটনা এখনো ভুলিনি। এক রাত্রে মায়ের ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল।

বাবা বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, 'ব্যাপার কি?'

মা বললেন, 'দেখবে এস।'

আমাদের শোবার ঘরের সামনেই ছিল একটা দালান, তারপর উঠান এবং উঠানের তিনদিকে কয়েকখানা ঘর। বাবা ও মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমিও গেলুম তাঁদের পিছনে পিছনে।

দালান থেকে বেরিয়েই অবাক হয়ে দেখলুম, উঠানের উপরে মাটি থেকে প্রায় চার হাত উঁচুতে জ্বলছে আশ্চর্য একটা আলো। দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, প্রদীপ, বাতি, লণ্ঠন বা মশাল থেকে সে আলোর উৎপত্তি নয়। নীলাভ আলো, আকার ক্রিকেট বলের মতন। চাঁদের কিরণে ধব্‌ধবে উঠানের উপরে আলোটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নেচে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে এক একটা ঘরে দরজার কাছে গিয়ে যেন ঠোকর খেয়েই আবার আসছে।

মায়ের বাধা না মেনে বাবা উঠানের দিকে অগ্রসর হলেন—আলোটাও হঠাৎ নিবে গেল।

তারপর কয়েক রাত ধরে আর একরকম কাণ্ড! গভীর রাত্রে উঠানের ধারের

ঘরগুলোর দরজায় দরজায় শিকল বেজে ওঠে ঝন্ ঝন্, ঝন্ ঝন্! বাবা বাইরে ছুটে যান, কিন্তু কারুকে দেখতে পান না। হয়তো বাইরের দুষ্টু লোক এসে ভয় দেখাচ্ছে এই ভেবে ভিতরে ঢুকবার দুই দরজায় তালা-চাবি লাগানো হল, কিন্তু তবু থামল না শিকল-সঙ্গীত।

মা তো ভয়ে সারা। বলেন, এ অলক্ষুণে বাড়ি ছেড়ে চল! বাবা কিন্তু অটল। বলেন, আলো দেখিয়ে আর শিকল বাজিয়ে কোন পাঠান-ভূত আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

পাঠান-ভূতেরা শেষটা হতাশ হয়ে আলো দেখানোর ও শিকল-বাজানোর কাজে ইস্তফা দিলে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি গুরুতর এবং ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা।

আমাদের পৈতৃক বসতবাড়ি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। তিন-মহলা বাড়ি, তারপরে একটা হাত-দেড়েক চওড়া খানা, তারপরে আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের এক সারে তিনখানা বাড়ি। শেষোক্ত তিনখানা বাড়ির মধ্যে একখানা ছিল খালি—ভৌতিক বাড়ি বলে তার ভিতরে কেউ বাস করতে পারত না।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ভূতকে ভয় করি না—যদিও ভূতের গল্প শুনতে বা পড়তে খুব ভালবাসি। মনে আছে, বালক-বয়সে একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাদ থেকে পাঁচিল বেয়ে সেই হানাবাড়িতে নেমেছিলুম—ভূতকে বধ করবার জন্যে আমার হাতে একখানি কাটারি!

দোতলা ও একতলার প্রত্যেক ঘরে ঢুকে দেখলুম খালি দুই-ইঞ্চি পুরু ধুলো এবং ধুলোর উপরে নানা আকারের পদচিহ্ন। একটা ঘরে রয়েছে ধুলো ভরা তৈলহীন প্রদীপের ভিতরে আধ-পোড়া সলিতা এবং আর একটা ঘরের মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা কঙ্কাল! তোমরা চমকে উঠো না, কারণ সেটা হচ্ছে বিড়ালের কঙ্কাল! ভূত দেখাও দিলে না, কোনরকম শব্দ-টব্দ করবার বা কথা কইবার চেষ্টা করলে না,—বোধহয় আমার হাতে কাটারি দেখে, ভয় পেয়েছিল। অথচ এই বাড়িরই ছাদের উপরে ঘটেছিল একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। তখন আমার বয়স দশ বৎসরের বেশি নয়।

আমার বাবার একটি অভ্যাস ছিল। গ্রীষ্মকালের রাত্রে তিনি খোলা ছাদের উপরে শয়ন করতেন। একদিন অনেক রাতে বিষম গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, কাকারা আমার বাবার অচেতন দেহ বহন করে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছেন।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বাবার জ্ঞান হল। তারপর তখন এবং পরেও বাবার মুখে একাধিকবার যে কাহিনীটি শুনেছি তা হচ্ছে এই :—

ছাদের উপরে উঠে ঘুমোবার আগে বাবা খানিকক্ষণ পায়চারি করতেন।

দুই-তিন দিন পায়চারি করতে করতে বাবা দেখতে পেলেন, খানার ওপাশে হানাবাড়ির ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেতবসনা নারীমূর্তি।

ওদিকের পাশাপাশি তিন বাড়ির একটা ছাদে উঠলেই অন্য দুটো ছাদের উপরে অনায়াসে যাওয়া যেত। হানাবাড়ির ও তার পাশের বাড়ির ছাদে ওঠবার সিঁড়ি ছিল না। বাকি যে বাড়ির সিঁড়ি ছিল তার মধ্যে বাস করতেন 'রাঙা গিন্নী' নামে এক বিধবা নারী ও 'তুলসীর মা' নামে এক মহিলা। ছাদের উপরে প্রথম দুই-তিন দিন নারীমূর্তি দেখে বাবা ভেবেছিলেন, গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে নিশ্চয়ই 'রাঙা গিন্নী' বা 'তুলসীর মা' ছাদের উপরে উঠে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঘটনার দিন বাবা অনেক রাতে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছিলেন। আহারাদি সেরে তিনি যখন ছাদের উপরে শয়ন করতে যান তখন প্রায় তিনটে।

নিঝুম রাতে বৈশাখী জ্যোৎস্নায় চারিদিক সমুজ্জ্বল। বাবা সেদিনও স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটি নারীমূর্তি হানাবাড়ির ছাদ থেকে মাঝের বাড়ির ছাদের উপরে এসে দাঁড়াল।

আজ বাবার মনে কেমন সন্দেহ হল। ওই হানাবাড়িকে পাড়ার সকলেই ভয় করে। ও বাড়ি কেউ ভাড়া পর্যন্ত নেয় না। এই শেষ রাতে ওর ছাদের উপরে পাড়ার মেয়ের নিয়মিত আবির্ভাব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

দূর থেকে বাবা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কে তুমি দাঁড়িয়ে আছ?'

কোন সাড়া নেই।

বাবা এগুতে এগুতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রাঙা গিন্নী নাকি?...তুলসীর মা?'

মূর্তি উত্তর দিলে না।

বাবা তখন খানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতক্ষণে তিনি লক্ষ্য করলেন, মূর্তির মুখে ঘোমটা। রাঙা গিন্নী বা তুলসীর মা বাবার সামনে ঘোমটা দিতেন না। ওখানে অন্য কোনও মেয়ের আসবার কথাও নয়। তবে কে এই নারী?

মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতেও তার কাপড়ের ভিতর থেকে দেহের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। তার ভাবভঙ্গি বৃদ্ধার মতন নয় বটে, কিন্তু সে যুবতী কি প্রৌঢ়া, তাও বোঝবার উপায় নেই।

বাবা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে খানা ডিঙিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের উপরে গিয়ে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন, নিশ্চয় এ কোন মেয়ে-চোর! ধরা পড়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা তার দিকে অগ্রসর হতেই সে পায়ে পায়ে পিছোতে লাগল।

বাবা বললেন, দাঁড়াও। শিগ্‌গির বল কে তুমি?'

কোন জবাব না দিয়ে মূর্তি পিছোতে লাগল। ক্রমে তার সঙ্গে বাবাও হানাবাড়ির ছাদের উপরে গিয়ে পড়লেন।

নারীমূর্তি একেবারে ছাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর আর পিছোবার উপায় নেই।

—'আর কোথায় পালাবে? এখন আমার কথার জবাব দাও। কে তুমি?' বলে বাবা আরো দুই পা এগিয়ে গেলেন।

তারপর যা হল সেটা একেবারেই কল্পনাতীত। বাবা যখন মূর্তির কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, তখন পূর্ণ চন্দ্রালোকেই সেই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি যেন হাওয়ার ভিতরে মিলিয়ে গেল।

বাবা অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, তিনি যে ভূতকে ভয় করতেন না এ কথা আমি জানি। কিন্তু এই অপার্থিব দৃশ্য দেখে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমাদের বসতবাড়ি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের অংশে পড়ে বাড়ির পিছন-দিকটা। খানার ধারে হানাবাড়ির ঠিক পাশেই তেতলার ঘরে আমি বহু বৎসর শয়ন করেছিলুম, কিন্তু প্রেতিনী-দর্শনের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনদিন আমার হয়নি।

বাবা এর পরেও গ্রীষ্মকালে ছাদে শয়ন করতেন, কিন্তু কোন ছায়ামূর্তিই আর তিনি দেখতে পাননি। হানাবাড়িখানাও পরে সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ভাড়াটিয়া ভূতের ভয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেনি।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী, নির্ভীক, স্বল্পবাক ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে মিথ্যা ভয় পেয়েছিলেন বা কাল্পনিক গল্পকে সত্য বলে চালিয়েছিলেন, এমন অসম্ভব কথা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারি না।



বোতলের ভূত

সুখলতা রাও



একজন গরীব কাঠুরে ছিল। সে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঠ কাটত। কাঠ কেটে যখন তার কিছু টাকা জমল, তখন সে সেই টাকা দিয়ে তার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিল শহরে লেখাপড়া শিখতে।

ছেলে খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে, তার বেশ নামও হচ্ছে, এর মধ্যে তার বাবার টাকা গেল ফুরিয়ে। কাজেই তার লেখাপড়া শেখা হল না, সে বাড়ি ফিরে এল। কাঠুরেরও তাতে বড় দুঃখ হল। ছেলেটি তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল, 'তার জন্য ভাবছ কেন বাবা? যদি কপালে থাকে, ঢের লেখাপড়া হবে। এখন চল কাঠ কাটতে যাই।' কাঠুরে বলে, ' তোমার গিয়ে কাজ নেই। কখনো কাঠ কাটোনি, এত পরিশ্রম করতে তুমি কি পারবে? আর আমাদের তো একখানা বই কুড়ুল নেই।' কিন্তু ছেলে যাবেই ঠিক করেছে। সে বলল, "আর কারো কাছ থেকে একটা কুড়ুল চেয়ে আন বাবা। তারপর ক'দিন কাঠ কাটলে যে পয়সা হবে, তাই দিয়ে একটা নূতন কুড়ুল কেনা যাবে।"

তখন আরেকজনের কুড়ুল ধার করে নিয়ে দু'জনে বনের ভিতরে গেল কাঠ কাটতে। দুপুরবেলায় কাঠুরে কুড়ুল রেখে, তার ছেলেকে ডাকল, 'এস একটু বিশ্রাম করে, চারটি খেয়ে নিই। বড় পরিশ্রম হয়েছে!' কিন্তু ছেলের ইচ্ছা নেই বিশ্রাম করতে। 'তুমি খাও। আমার মোটেই খিদে পায়নি। আমি একটু ঘুরে দেখে কোনও গাছে পাখির বাসা আছে কিনা।' বলে সে পাখির বাসা খুঁজতে বেরুল। তারপর এ-গাছ ও-গাছ দেখতে দেখতে, এক প্রকাণ্ড বটগাছের কাছে এল। তিনশো বছরের পুরনো বটগাছ, ডালপাতায় চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে; ডাল থেকে মোটা মোটা শিকড় সব মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কাঠুরের ছেলে ভাবল, 'এর ভিতর নিশ্চয় অনেক পাখির বাসা পাওয়া যাবে।' এই ভেবে সে বটগাছের কাছে গিয়ে, উপরের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল—পাখির বাসা আছে কিনা। হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন বলছে, 'আমাকে খুলে দাও গো, আমাকে খুলে দাও।' সে এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আবার কে যেন বলছে, 'খুলে দাও গো, খুলে দাও।' তখন সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে খুলে দিতে ডাকল? কোথায় তুমি?' সে কথার উত্তর এল, 'এই যে গাছের শিকড়ের নিচে।' তখন ছেলেটি নিচের দিকে তাকিয়ে, বটগাছের একটা শিকড়ের তলায় একটা বোতল দেখতে পেল। বোতলটাকে বার করে হাতে নিয়ে দেখে যে, তার ভিতরে ব্যাঙের মতো একটা কি যেন লাফাচ্ছে, আর চিঁচিঁ করে বলছে, 'আমাকে খুলে দাও, আমাকে খুলে দাও।' কাঠুরের ছেলে বোতলের ছিপিটা দিল খুলে। ওমা! অমনি সেই ব্যাঙের মতো জিনিসটা লাফিয়ে বাইরে এসে, দেখতে দেখতে দশটা বটগাছের মতো উঁচু হয়ে বলে কি—'এবার তোর ঘাড় ভাঙ্গব! আমি ঠিক করে রেখেছি যে, আমাকে বোতল থেকে যে বার করবে, আমি তার ঘাড় ভাঙ্গব।' কাঠুরের ছেলে কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেল না; সে জবাব দিল, 'এ কথা আগে বলতে হয়! তাহলে আর তোমাকে বোতল থেকে বেরুতে হতো না। ঘাড় ভাঙ্গা বুঝি অমন সহজ কথা! আগে সাক্ষী বার কর যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি!'

ভূত বলল, 'সাক্ষীটাক্ষী আমি জানি না। ছেড়ে যখন দিয়েছ, তখন ঘাড় ভাঙ্গবই।' কাঠুরের ছেলে তাকে থামিয়ে বলল, 'রোস, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তুমি ওই বোতলের ভিতরে ছিলে। অত বড় ভূতটা কি কখনও ওর ভিতর থাকতে পারে? ওসব তোমার মিথ্যা কথা।'

ভূতেরা মিথ্যা কথা বলে না, কাজেই তাকে মিথ্যাবাদী বলাতে ভূতটা ভারি চটে গিয়ে বলে, 'বটে! মিথ্যা কথা? তবে এই দেখ।' বলেই, সুড়ুৎ করে আবার ব্যাঙের মতো ছোট্ট হয়ে বোতলে গিয়ে ঢুকল আর কাঠুরের ছেলেও অমনি তাড়াতাড়ি দিল তাতে ছিপি এঁটে। ভূত ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল—'আরে, আরে! করিস্ কি করিস্ কি!' কিন্তু কে তার কথা শোনে। বোতলে বেশ ভালমতো ছিপিটা এঁটে, তাকে আবার সেই বটগাছের নিচে রেখে দিয়ে, কাঠুরের ছেলে হাসতে হাসতে সেখান থেকে রওনা হল! তখন ভূতের আর তেজ নেই; সে মিনতি করে ডাকতে লাগল, 'ওগো, চলে যেও না। আমাকে খুলে দিয়ে যাও।' কাঠুরের ছেলে চলতে চলতে মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু। আর ছাড়ছি না। আমাকে বোকা পাওনি।' সে সত্যিই যায় দেখে, ভূত আবার হাতজোড় করে ডাকল, 'লক্ষ্মী দাদা, চলে যেয়ো না, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে এমন জিনিস দেব, যা দিয়ে তুমি চিরকাল সুখে থাকতে পারবে।'

'যা দিয়ে চিরকাল সুখে থাকতে পারা যায় এমন জিনিস যদি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি?' ভেবে কাঠুরের ছেলে ফিরে এসে বোতলের ছিপি খুলে দিল। ভূতটা বোতল থেকে বেরিয়ে, আবার বটগাছের মতো বড় হয়ে বলল, 'দেখ, আমি সত্যি কথা বলি কিনা। এই জিনিসটা নাও। এটাকে লোহা আর ইস্পাতে ছোঁয়ালেই তা রুপো হয়ে যাবে।'

সে জিনিস আর কিছু নয়, এক টুকরো ছেঁড়া নেকড়া। কাঠুরের ছেলে সেটি হাতে নিয়েই আগে পরীক্ষা করে দেখল। তার কুড়ুলটা রুপোর হয়ে গেল। তখন ভূতকে নমস্কার করে অনেক ধন্যবাদ দিয়েকুড়ুল চলে গেল বাবার কাছে।

এদিকে ছেলের দেরি দেখে কাঠুরে ব্যস্ত হয়েছে। ছেলে ফিরে আসতেই সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বেলা চলে গেল, কাঠ কাটবে কখন?' 'এই যে বাবা, এখনি কাটছি। আমার কিছু দেরি হবে না।' বলে ছেলেটি যেই একটা গাছে কোপ্ দিয়েছে, অমনি কুড়ুলের মুখ গিয়েছে বেঁকে। খাঁটি রুপো তো আর লোহার মতো শক্ত হয় না। তা দিয়ে কাঠ কাটা চলবে কেন? ছেলেটি তার বাবাকে বাঁকা কুড়ুলটা দেখিয়ে বলল, 'আমাকে কি রকম কুড়ুল দিয়েছ যে কাটতে না কাটতেই ভেঙ্গে গেল?' কাঠুরে তাকে 'কি করলি! ভেঙ্গে ফেললি? সর্বনাশ! এখন যার কুড়ুল তাকে গিয়ে বলি কি?'

এই সব বলে ভারি ব্যস্ত হতে লাগল। ছেলে বলল, 'রাগ কোর না বাবা। কালকেই এ কুড়ুলের দাম দিয়ে দেব।' কাঠুরে আরো রেগে বলল, 'তামাশা রেখে দে। ভাত জোটে না আবার কুড়ুলের দাম দেবেন!'

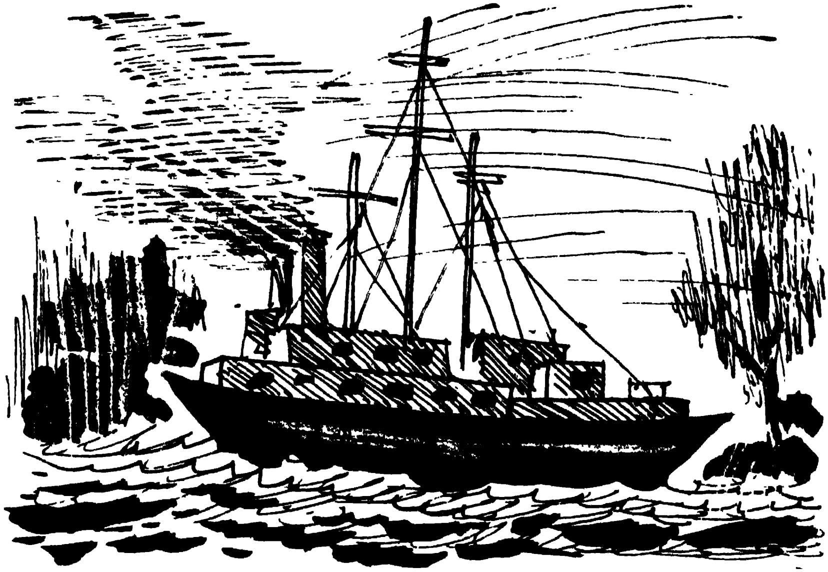
বাড়ি গিয়ে কাঠুরে ছেলেকে পাঠিয়ে দিল বাজারে—'যা, ভাঙ্গা কুড়ুলটা বাজারে বেচে আয়। দু'-চার পয়সা যা হয় হবে। বাকি আমাকে খেটেখুটে যোগাড় করে দিতে হবে আর কি।'

কুড়ুলখানা নিয়ে কাঠুরের ছেলে এক সেকরার কাছে তিনশো টাকায় বেচে এল। বাড়ি এসে সে তার বাবাকে বলল, 'যার কুড়ুল তাকে জিজ্ঞাসা করে এস তার কুড়ুলের দাম কত ছিল। আমি ভাঙ্গা কুড়ুলখানা বেচে এসেছি।' 'জিজ্ঞাসা করে কি হবে? কুড়ুলখানার দাম ছিল আট আনা। ভাঙ্গা কুড়ুল বেচে তুই আর কত এনে থাকবি!' বলল তার বাবা। 'এই নাও, একটা টাকা তাকে দিয়ে এস। আর এই নাও, বাকি দু'শো নিরানব্বই টাকা।' বলে ছেলে কাঠুরের হাতে টাকা গুনে দিল। কাঠুরে তো অবাক! 'সে কি রে! এত টাকা কোথায় পেলি?' তখন ছেলেটি বোতলের ভূতের গল্প বলে নেকড়াটুকু তার হাতে দিল। সেই থেকে আর তাদের কষ্ট করে খেতে হয় না। ছেলেটিও আবার শহরে গিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল।



মশলাভূত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



বড়বাজারের মসলাপোস্তার দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েছে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশি খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডান হাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো, এমন সময় হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—'বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!'—বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেছে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো

যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, 'দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?'

হাজারি বললে, 'এসো এসো, যতীন। ভাল আছ? অনেক দিন দেখিনি। কিছু খবর আছে নাকি?'

'সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে?...এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক্, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি মন দিয়ে শোন...'

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপিচুপি তার কথাটা বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো সে, সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম্ ট্রেডিং কোম্পানির একটা মস্ত মাল-জাহাজ এস্. এস্. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইণ্ডিজের কোনও এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সবচেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মাল-জাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মণ্ডহারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেছে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ্গ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারল না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকী মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবেনি—বিশেষ ক্ষতিও হয়নি। দূর থেকে ওই মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্ট-কমিশনের লোকেরা সে সব তুলে পাড়ে টেনে নেয়। কাল

সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রি করা হবে।।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিল। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।'

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেছে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটছে। এত বড় সস্তার কিস্তিটা ফস্‌কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দু'মিনিট ফিসফাস করে কি কথাবার্তা বলে হাজারি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, 'কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?'

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্তভাবে বললে, 'পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?'

'একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।'

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুন্‌তি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারো ভাগ্যে একবার বই দু'বার আসে না! এখন মসলাপোস্তার কোনরকমে তার গুদামে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'আর দেরি নয়'—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, 'ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।'

একেবারে সব মাল লরিতে ধরলো না। দ্বিতীয় খেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন

যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশিকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েছে। চতুর্দিকে লোকের মহা ভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিশ তাড়া দিচ্ছে—'জলদি মাল হঠাও!' হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পারছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তাগুলো উঁচুও কি কম! এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রে গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদামে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশেপাশের দোকানদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বেলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদামের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদামের ভেতর থেকেই আসছে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোরটোর যদি না এলো তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো, ঘরের ভেতর দরজায় ধাক্কা মারছে। শেষ রাতের বাকী সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদামঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদামে ঢুকে দেখে

বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার?—তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলাবস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়ে ছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েছে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এই সব আয়োজন করছে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ি না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে!

করলেও তাই। রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদামের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচ পর্যন্ত পাতি পাতি করে প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতর থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটা নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হতেই হাজারির ঘুম ভেঙে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ? ধপাস্—ধুপ্-দুম্-দুম্-দাম্! ঘরের ভেতর বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য-দানবের লড়াই বেধেছে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটো ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারছে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখেছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারির চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। সঙ্গে শব্দ-টব্দও থেমে গিয়েছে। হরে অমনি বলে

উঠলো, 'বাবু, সেদিনও দেখেছি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।' হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতকগুলো বস্তা হাণ্ডুল-বাণ্ডুল অবস্থায় পড়ে রয়েছে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল! চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবির লোকগুলো ডুবে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এইভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি! হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে। আজ সে মরীয়া হয়ে দু'জন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েছে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। ঢং ঢং ঢং ঢং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড! শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার দোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়ে ছিল, হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, 'তোরা শিগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেছে নাকি।' তারপর হাজারি গুদামের তালা খুলে ফেলল।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, 'বাবু, এদিকে চেয়ে দেখুন!'—হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, 'এ্যাঁ, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচছে?' চাকর দু'জন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্ ঠক্ করে ঠিক্‌রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সামনে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্র্যাণ্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেছে, পেছনে পেছনে চলছে সারবন্দী গুদামের অন্য অন্য বস্তা। এইভাবে হাজারির মসলার গুদাম উজাড় হয়ে গেল।

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ। গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তাগুলো গঙ্গার জলে দিল ডুব। এই ভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদামের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে, হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে একবাক্যে বললে, 'হুঁ হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজডুবি। আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপ্টে হাজারি বিশ্বাস! ভাগ্যিস বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষিনি। এ মাল কিনলে আমাদেরও কি রক্ষা থাকতো!'



অশরীরী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



আর সকলের বিবৃতি শেষ হইলে শৈলেনের উপর তাগাদা হইল, 'এবার এ-বিষয়ে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে বল।'

শৈলেন বলিল, 'আমায় বরং ছেড়ে দাও।'

সুধেন প্রশ্ন করিল, 'তার কারণ?'

শৈলেন বলিল, 'আমি যদি কিছু বলতে যাই, তোমরা তার মধ্যে নিশ্চয় কোন গল্পের প্লট আছে মনে করে বসো। ফলে এমন সন্দেহের সঙ্গে প্রত্যেক কথাটি শোন তোমরা যে, আমি বলে কোনও আরামই পাই না। কোথায় ভরা বিশ্বাসে মন দিয়ে শুনবে, না কেবলই আমার প্লটের ফাঁকি ধরে ফেলবার চেষ্টা! যখন সত্যিই কোনও গল্প হাঁকড়াই, তখন এটা সহ্য করা যায়, কিন্তু যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছি, তখনও যদি—'

তারাপদ বলিল, 'এতে অভিমানের কিছু নেই, এ তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা লেখকেরা সামান্য অভিজ্ঞতাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সচেতন, অচেতন, অবচেতন নানা রকম জিনিসের দোহাই দিয়ে এমন একটা জিনিসে দাঁড় করাও যে, তোমরা যে কখনও সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।'

সুধেন বলিল, 'ও বেচারাদের মুশকিল আছে, সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখলে ওদের পেট চলে না। তোমরা চাও রস, সত্য কথায় তা মোটেই নেই।

যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জীবন আগাগোড়া দেখে গেলে মাত্র একটিবার রস বা রসিকতার সন্ধান মিলবে—যখন তিনি 'ইতি গজ' বলেছিলেন। অবশ্য কখনও রসের অপব্যয় করেননি বলে রসিকতাটা একটু মারাত্মক রকম হয়ে জমে উঠেছিল—নাও শৈলেন, এই চমৎকার রাত্রের উপযোগী একটা গল্প ফাঁদ—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় ভালই, গাল-গল্প হয় আরও ভাল, এই ভুতুড়ে রাত্রির রুদ্ররসে আমরা একটু ডুবে থাকতে চাই।'

সুধেন র‍্যাপারটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া গুটাইয়া সুটাইয়া বসিল।

শৈলেন বলিল, 'নাঃ, মিথ্যেবাদী বলে ক্রমেই যেরকম বদনাম হয়ে যাচ্ছে, সত্যিকার অভিজ্ঞতাই একটা বলি।'

সুধেন বলিল, 'আমার গা শিউরনো চাই কিন্তু। সেইজন্যে আমি গা আর মন দুটোকেই মুড়ি দিয়ে তোয়ের হয়ে বসেছি।'

শৈলেন বলিল, 'যাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় করে সংজ্ঞালোপ করে দিয়েছিল, তাতে তোমার গায়ে একটু কাঁটাও জাগাতে পারবে না, এত বড় বীর তোমায় আমি মনে করি না।'

একটু চুপচাপ গেল; অলৌকিক গল্পের উপক্রমণিকা হইতেছে মৌনতা। গল্প বলিবার বা শুনিবার আগে লোকে যেন অনুভব করে, সে একটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করিতেছে, চকিত হইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়ায়।

শৈলেন দূর ভবিষ্যতে কোথায় যেন একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

ব্যাপারটা ঘটে ছোটনাগপুর সাইডে একটা জায়গায়—একটা ডাকবাংলোয়। জায়গাটার নাম আর খুলে বললাম না। রাঁচী থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো রাস্তা অনেক দিকে চলে গেছে, তারই একটার একটা ডাকবাংলোর কথা বলছি। আমার তখন তিন বছরের জন্যে বনবাস,—ফরেস্ট রেঞ্জার্সের চাকরি নিয়েছি, একটা জঙ্গলের চার্জ নিতে হবে।

মোটরবাসে চলেছি। শীতের সময়, বেলা প্রায় চারটের সময়ই দিন মলিন হয়ে এল। দূরে আকাশের কোলে এমুড়ো-ওমুড়ো একটা লম্বা পাহাড়ের রেখা আমাদের মোটর এগুবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; যেন বিরাটকায় কি-একটা এতক্ষণ শুয়ে ছিল, আমাদের এগুতে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভয়, আগ্রহ, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা কৌতুক বোধ করছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই

আমরা পাহাড়ের নিচে পৌঁছে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। যখন প্রায় শিখরদেশে পৌঁছেছি, মোটর গেল বিগড়ে। সারাতে দেরি হবে, রাত্রি হয়ে যাবে। সান্ধ্য পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে আমি মোটর থেকে নেমে খানিকটা তফাতে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে রয়েছে একটা খাড়া শিখর, সামনে গভীর খাত,—খুব গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনটার ওপর জেঁকে বসতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ, রহস্যময়। অত বড় একটা বিরাট ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর অসহায় বলে মনে হতে লাগল। কি যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব,—যদি পাহাড়ের ওপর কোনও সন্ধ্যা বা রাত্রি না কাটিয়ে থাক তো বুঝতে পারবে না। অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল যে, যে বিরাটকায় জীবটা খানিকটা আগে আমাদের দেখে জেগে উঠেছিল, তারই গর্ভে আস্তে আস্তে জীর্ণ হয়ে চলেছি। এই আতঙ্কের মধ্যে যখন মগ্ন হয়ে রয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে আগুনের ভাঁটার মতো প্রকাণ্ড দুটো চোখ জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তলুব্ধ জন্তুর গর্জনের মতো এমন একটা উৎকট আওয়াজ চারিদিক কাঁপিয়ে উঠল যে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি পাথরের ওপর থেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—'

সুধেন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, 'ভাঁটার মতো চোখ নিয়ে চিৎকার করে উঠল? তোমার কল্পনার অজগর বাস্তব হয়ে পড়ল নাকি?'

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, 'তখুনি নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা আসলে এই যে—মোটর তোয়ের হয়েছে, ইলেকট্রিক হর্ন দিয়ে হেড্‌লাইট জ্বেলেছে, সামনের একটা পাথরের গায়ে তার আলো ঠিকরে পড়েছে।'

হাসি পেল—ভয়ে এমন তন্ময় করে সব ভুলিয়ে দেয়!—এক্ষুণি যে কোন্ অতলে তলিয়ে যেতাম!

মোটরে এসে উঠলাম। পাহাড়ের পথ দুই চক্ষু দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে ফিরে মোটর নামতে লাগল।

কেন জানি না, ঐ যে সন্ধ্যায় কেমন একটা অহেতুক ভয়ের ছাপ মনের ওপর পড়ল—কোনমতেই যেন তা কাটতে চায় না। আমার যে আজকের রাত্রিটা একলা একটা ডাকবাংলোয় কাটাতে হবে, এই চিন্তাটা আমায় পীড়া দিতে লাগল। বরাবরই কেমন যেন অন্যমনস্ক আর মনমরা হয়ে রইলাম। বিপদের ওপর বিপদ, মোটর আর একবার বাগড়া দিলে, আরও প্রায় কোয়ার্টার

তিনেক গেল। পাহাড় থেকে যখন নামলুম, তখন দিব্যি রাত হয়ে গেছে। যখন ডাকবাংলোর সামনে পৌঁছলাম, কব্জি উল্টে হাত-ঘড়িতে দেখি, সাড়ে ন'টা। শীতের সাড়ে ন'টাকে গভীর রাত্রিই বলতে হয়, সে নিষুতি আবেষ্টনীর মধ্যে প্রায় দুপুররাতের সামিল।

ড্রাইভার কয়েকবার ঘন ঘন হর্ন দিলে। কোনও সাড়া নেই। ড্রাইভার বললে, 'মোটর প্রায় ঘণ্টাচারেক লেট হয়ে গেল, কীপার গ্রামে চলে গেছে নিশ্চয়, অবশ্য যাওয়া বেটার উচিত হয়নি। ওর ডিউটি হচ্ছে মোটর যাওয়া নিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া, কোন লোক না নামলে—'

খাতির করে আমার বাক্স, বিছানার গাঁটরি আর সুটকেসটা ডাকবাংলোর বারান্দায় এনে রেখে দিলে। বললে, 'আপনার টর্চ রয়েছেই, একটু দূরেই গ্রাম, সেখানে গেলেই তারা কীপারকে ডেকে দেবে। কিন্তু বাবু...' কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

প্রশ্ন করলাম, 'কি?'

এই সময় মোটর থেকে তাগাদার হর্ন বেজে উঠল।

না, কিছু নয়। মানে, এখানকার যে কীপার....

আবার তাগাদা হওয়ায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললে,—'একলা মানুষ, তা ভয় পাবার কিছু নেই এমন,'....কিছু বলতেও পারলাম না; প্রায় ঘণ্টা তিন-চার লেট যাচ্ছে, তায় নিজে হতেই একটু খাতির করলে। আর বলবার ছিলই বা কি? মোটরটা চলে গেল। যতক্ষণ তার একটুও আওয়াজ শোনা গেল, কান পেতে রইলাম, একবার একটা শেষ হর্নের পর একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল. —যেমন দপ করে একবার জ্বলে উঠে প্রদীপ নেবে, আওয়াজটাও সেই রকম একটা আর্তনাদ করে যেন নিবে গেল। নির্জন বাড়িটার বারান্দায় আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা চারিদিকে পরিস্কার, বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টির সীমার বাইরেই নিবিড় অন্ধকার, ডান দিকটায় অন্ধকার যেন আরও এক পোঁছ ঘন, যেটা পেরিয়ে এলাম, সেই পাহাড়টা আর কি।

বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। টর্চটা জ্বেলে গ্রামের ঠিক দিকে যাই তো হয়তো পাশেই পাব, যদি ভুল দিকে পা বাড়াই তো বোধ হয় এমন দু'-চার মাইল গিয়েও মানুষের চিহ্ন পাব না, দেখে তো আসছি সমস্ত দিন, নিতান্ত বিরল-বসতি দেশ।

রক্ষকটা সম্বন্ধে ড্রাইভার কি বলতে চাইছিল—থেমেই বা গেল কেন?...

কি করব না করব, কিছুই ঠিক করতে না পেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর কি মনে করে পা বাড়াব, পায়ের পিছনের দিকটায় একটা লম্বা ভিজে টানে আচমকা শিউরে উঠলাম। ফিরে দেখি, একটা খুব বড় কালো কুকুর। তাড়াতে গিয়ে আরও শিউরে উঠলাম হঠাৎ মানুষের আওয়াজ শুনে, কাছেই, বারান্দায় কোণের কাছটায়। কুকুরের খটকাটা সামলাতে না সামলাতেই হঠাৎ এটা কানে যাওয়ায় একটু অভিভূত হয়ে উঠেছি, এমন সময় কুকুরকে শাসাতে শাসাতেই একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, সামনে এসে সেলাম করে বললে—'ও কিছু বলবে না হুজুর।..... মোটরে আজ আপনাদের খুব দেরি হয়ে গেল, কিছু দুর্ঘটনা হয়েছিল নাকি?'

লোকটার খুব বয়েস হয়েছে বলে মনে হল, আর আশ্চর্য রকম রোগা। এত রোগা যে চলছে তা মাটিতে পায়ের আওয়াজটুকুও হচ্ছে না যেন। গায়ে প্রায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া একটা সাদা কম্বল। আঙুলগুলো এত শীর্ণ আর অস্থিসার যে, মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। মোটর ছাড়ার পর থেকে যে একটা কেমন ছমছমে ভাব মনে লেগেছিল, মানুষ দেখে সেটা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যাওয়া তো দূরের কথা, বরং বেশ একটু বেড়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না; উত্তর দেওয়াই হল না বলা ঠিক। তাকে আড়াচোখে একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে বললাম, 'চাবি খোল।'

এই যে খুলি। বলে আমার আর দোরের মাঝখানটায় আমার দিকে পেছন করে দাঁড়াল আর ঝুঁকে যেন কোমরের চাবিটা তালায় লাগিয়ে দিয়ে তালাটা খুলে ফেললে। দরজা দুটো ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যান। আমি বাক্স-বিছানা নিয়ে আসছি ভেতরে।'

তালা খুলল বটে, কিন্তু আমার যেন মনে হল, কোন শব্দ হল না। যা হোক, অতটা গ্রাহ্য না করে আমি বললাম, 'তবেই হয়েছে, তোমার যেমন সবল দেখছি...'

লোকটা হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

আমায় কথাটা বলেই বারান্দায় মোটগুলোর দিকে চলে গিয়েছিল বলে ওর মুখটা দেখতে পেলাম না বটে, তবে হাসির আওয়াজটা কানে একটু নতুন ধরনের ঠেকল। যেন মুক্ত মাঠের ওপর দিয়ে যে একটা কনকনে হাওয়া হু-হু

করে বয়ে যাচ্ছে, তারই একটা ঝলক ঘরের মধ্যে ঢুকে তরঙ্গিত হয়ে আবার কোন্ পথে বেরিয়ে গেল। হাসি, কিন্তু ঐ হাওয়ার মতোই সুরহীন আর কনকনে, আমার হাড় পর্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

ভয়ের এত সামনাসামনি কখনও হইনি, কিন্তু নিরুপায়; আর নিরুপায় বলে জবরদস্তি একটা ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করলাম—না, নিশ্চয় মানুষ। নিজের মনকে ধিক্কার দেওয়ারও চেষ্টা করলাম—দেখ তো, কথা কইলে একঝুড়ি, মোট আনতে গেল, মানুষ নয়?

টর্চটা জ্বেলে ঘরে ঢুকে একবার দেখে নিলাম। বেশ বড় ঘরটা, টর্চ ফেলতে আলোটা সামনে একটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতর দিকে আর একটা দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল, অর্থাৎ এই ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর আছে, ছোটই বলে মনে হল। বাক্স-বিছানা আনার কোন শব্দ না পেয়ে ফিরে টর্চ ফেলে দেখতে যাব, দেখি সবগুলি ঠিক পেছনে জড়ো করা হয়েছে।.....সুধেন, কি রকম লাগছে?

ডাক শুনিয়া সুধেন একটু চমকিয়া উঠিল, একেবারে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল আর কি। সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'বেশ, এত হাতের কাছে যে ভূতকে পাব, কল্পনাও করতে পারিনি! আর এত স্পষ্ট ভূত যে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন সাহিত্যিক গল্পের অবতারণা করেনি...'

তারাপদ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'হদ্দ একটা গাঁজাখুরি আরম্ভ করেছে। তা সে বরং ভাল! তুমি দুঃখ করছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের সাহিত্যিক গল্পে সর্বদাই একটা যেন ধুকপুকুনি লেগে থাকে। হয়তো যা ভাবছি তা নয়, হয়তো যা হবে মনে করছি ঠিক তার উল্টোটি হয়ে বসবে, হয়তো ঠিক করে রেখেছি এইবার বিয়ে হবে, দু'জনের একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।....নাও, বেশ বিষ্টিটা জমে এসেছে! সেই অত্যন্ত রোগা বুড়োটি নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে সেই অত্যন্ত ভারী মোটমাটগুলো এনে তোমার পেছনে জড়ো করলে। তারপর?'

শৈলেন বলিল, 'জিনিসটা বোধ হয় গাঁজাখুরির মতো শোনাচ্ছে,, কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, যা প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম আর নিজের কানে শুনেছিলাম, মাত্র তাই তোমাদের কাছে বলে যাচ্ছি। একটা কথা আমি গোড়াতেই বলে রেখেছি, লুকোইনি, অর্থাৎ সেদিন সন্ধে থেকেই কেমন একটা থমথমে ভাব আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—পাহাড়ের ওপরের সেই গম্ভীর স্তম্ভিত ভাব, তারপর সেই জনহীন বাংলোতে সেইভাবে একলা পরিত্যক্ত হওয়া,

সেই কালো কুকুরটাকে নিঃশব্দে এসে পা চেটে দেওয়া, তারপরে আচমকা সেই শীর্ণ লোকটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভাব—সব মিলিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমার আতঙ্কটা পুষ্ট করে যাচ্ছিল। ওরই মধ্যে আবার লোকটাকে পেয়ে এক-আধ বার একটু সাহসের মতো হয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু সে ভাবটা স্থায়ী হতে পেল না। হয়তো জিনিসগুলো আনতে, রাখতে শব্দ হয়েছিল। প্রেত ইথারজাতীয় বটে; কিন্তু সে যা স্পর্শ করবে তাও যে লঘু হয়ে যাবে, এমন কথা আমি কোথাও পাইনি। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুনই হোক বা যে জন্যেই হোক, ঘুরে জিনিসগুলোর ওপর নজর পড়তেই মনে হল, কই, শব্দ শুনলাম না তো!'

একটা কথা বলিনি, লোকটা —আমি 'লোকটা' বলেই চালাই—কোনও আলো সঙ্গে আনেনি।

তিন-চারটে জিনিস এল—দিব্যি ওজনদুরস্ত, অথচ একটু শব্দ কানে এল না, আর এসে পড়লও যেন ফিরে না দেখতেই,—একটা বিশ্রী খট্‌কা লাগল। কি বলতে চেয়েছিল লোকটার সম্বন্ধে?—এই নয় তো যে সে নিজে দূরে থাকার দরুন সব সময় আসতে পারে না, আর...।

সেই ফাঁকতালে চিন্তার মাঝখানেই সমস্ত শরীরটা আমার শিউরে উঠল। আবার তখনই সে ভাবটা কেটে গেল, কেননা কড়া টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখছি একটা মানুষ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে, এই শুনলাম কথা কইলে,—স্বরটা একটু চাপা, কিন্তু নাকী নয়; এ অবস্থায় সন্দেহও আবার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনটাকে আবার ধাতস্থ করে নিলাম। বললাম, 'বিছানাটা পেতে ফেল দিকিনি।.....আচ্ছা, আগে আলোটা জ্বেলে ফেল। কোথায় আলোটা? টর্চ আর কতক্ষণ জ্বেলে রাখব? জ্বেলে রাখা মানেই তো পয়সা পোড়ানো।' আলাপটা সহজ করে ফেলবার জন্যে এইটুকু রসিকতাও করেছিলাম। লোকটা সেই রকম হি-হি করে হেসে উঠল, বললে, —'না, টর্চ আর আপনাকে বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখতে হবে না বাবু—হি-হি-হি-হি...'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মজা হল, টর্চের চাবিটা টিপে ধরে টর্চটা জ্বেলে রেখেছিলাম, আঙুলটা একটু আলগা হয়ে গিয়ে টর্চটা নিবে গেল। আলগাভাবে ধরে রাখলে স্প্রিংওলা টর্চগুলো হয়ই এ রকম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর জ্বলল না, ফিউজ হয়ে গেল।

বললাম, 'টর্চটা যে খারাপ হয়ে গেল।'

অত কড়া একটা আলো নেবায় আরও অন্ধকার হয়ে গেছে, কাউকে দেখতেও

পেলাম না, কোন উত্তরও পেলাম না।

টর্চটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে যাওয়াটা খেয়ালের মধ্যে আনিনি, ওরকম কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু উত্তর না পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত দুয়েকের মধ্যে এই লোকটা ছিল, অথচ উত্তর নেই কেন? একবার মনে হল হাতটা চালিয়ে দেখি—ঠেকে কিনা কারুর গায়ে; কিন্তু কেন বলতে পারি না, সাহস হল না ও পরীক্ষা করতে। নিজের গলার আওয়াজে নিজের ভয়টা ভাঙাবার জন্যে একটু জোর আওয়াজে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় গেলে?'

উত্তর নেই। শুধু হাওয়ার শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বুঝতে পারছি, শরীরটা ঝিমঝিম করে আসছে। মরিয়া হয়ে আরও জোরে বললাম, 'গেলে কোথায়? তোমায় যে আলো আনতে বললাম! শুনছ, গেলে....'

হঠাৎ থেমে যেতে হল, আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে ঘরটা এমন বোঝাই হয়ে গেল যে, মনে হল, অন্ধকার ঘরটায় কাদের মেলা বসে গেছে। আমার ভয়ে অতি সজাগ কানে শোনাল যেন ঘরের চারিদিকে শতকণ্ঠে কারা আমারই কথার ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি করে বলছে, 'গেলে কোথায়?... তোমায় যে আলো আনতে বললাম!...শুনছ?'

অনুভব করছি, মাথার চুলগুলো যেন কদমফুলের মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। কি যে করব, বুঝতে না পেরে অসাড় হয়ে খানিক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর পাশে নজর পড়তে মনে পড়ল, দরজাটা খোলা আছে। একটা চিৎকার করে ছুটে বেরুতে যাব, দেখি সামনের দেয়ালে একটি অস্পষ্ট আলো পড়ল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ঠন হাতে পাশের ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। পাশে জমাট-বাঁধা এক খাবলা অন্ধকারের মতো সেই কুকুরটা! ময়লা চিমনি, তেলটা খারাপ নিশ্চয়, খানিকটা ধোঁয়ার নিচে একটা মিটমিটে শিখা জ্বলছে। গাছের শেকড় যেমন মাটি আঁকড়ে থাকে, সেই রকমভাবে লিকলিকে কালো কালো আঙুল দিয়ে লোকটা লণ্ঠনের হাতলটা লেপটে ধরেছে। অস্পষ্ট আলো তার কোটরগত চোখে, উঁচু চোয়ালের হাড়ের ওপর পড়ে উৎকট দেখাচ্ছে।....কিন্তু তা দেখাক, রোগা মানুষ উপায় কি? যা হোক ভূত তো নয়, ভূতে তো আর আলো জ্বেলে আনবে না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'তাই বলি, তুমি বুঝি আলো জ্বালতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আলোটা জ্বেলে নিয়ে এলাম। এবার আপনার বিছানাটা করে দিই। খাবেন কি?'

ভূত-৪

বললাম, ' সেজন্যে ভাবনা নেই। টিফিন-কেরিয়ারে আমার খাবার আছে, তুমি শুধু বিছানাটা করে দাও।'

'কই, আপনার টিফিন-কেরিয়ার তো দেখলাম না!'

'সে কি!'—বলে ফিরে মোটগুলো দেখতেই চক্ষুস্থির। টিফিন-কেরিয়ারটা সত্যিই নেই! বিমূঢ়ভাবে একটু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। সরালে নাকি খাবারসুদ্ধ কেরিয়ারটা?

বললাম, 'বারান্দা থেকে আননি বোধ হয়, দাঁড়াও তো দেখি।'

আলোটা নিয়ে বারান্দায় এলাম, সেখানেও নেই কেরিয়ারটা। লোকটা মোটগুলো, ভেতরে নিয়ে আসবার সময় লুকিয়ে ফেলেনি তো? কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। আমি যতদূর বুঝলাম, ও বাইরে থেকে যেটুকু সময়ের মধ্যে জিনিস তিনটে এনেছে, তাতে একটা জিনিসই আনা চলে না, এর মধ্যে আর লুকোবার সময় পাবে কোথা থেকে? তবুও কেমন একটা জিদ ধরে গেল, সেই কালি-পড়া আলো নিয়ে সমস্ত বারান্দাটা এমুড়ো-ওমুড়ো একবার দেখে নিলাম। না পাওয়াতে আরও রোখ চেপে গেল—নিশ্চয় কোথাও রেখেছে। বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পেছনে গেলাম। একহারা বাংলো, মাঝখানে একটা বড় ঘর, দু'দিকে দুটো ছোট ছোট ঘর; সামনের দিকে বারান্দা আছে, পেছন দিকে তাও নেই। বাড়িটার পরেই পরিস্কার জমি। কোথায় লুকোবে? অথচ টিফিন-কেরিয়ার আমি এনেছি। বাসে একবার পড়ে গিয়ে বাটিগুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল, গুছিয়ে ভাল করে বসিয়ে দিলাম। তবে? চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দূরে নজর পড়ায় মনে হল, খানিকটা দূরে—কম্পাউণ্ডের শেষে একটা ঘরের মতো আছে। চোর যেন ধরে ফেলেছি এই রকম উৎসাহ নিয়ে এগুলাম। একটা ছোট্ট ঘরই, শেকল দেওয়া। ঢুকে ভেতরে গিয়ে দেখি, একটা কেরোসিন তেলের আধভরা টিন, গোটা দুই আলো, গোটা দুই বালতি; টিফিন-কেরিয়ার নেই। রাগ কি জিদ, কি নিরাশা, কি ঘরে ফিরে আবার সেই লোকটাকে দেখতে পাওয়ার ভয়—ঠিক বলতে পারি না, তবে এটা বেশ মনে আছে যে, নিশিতে পাওয়ার মতো আমি ক্রমাগতই সেই মিটমিটে লণ্ঠনটা হাতে করে বাড়িটার চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলেছি দু'বার, চারবার, পাঁচবার, তারপর আর হিসেব নেই; ঘুরেই চলেছি, মনে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—আমার খাবার কোথায় গেল? কেরিয়ারের মধ্যে করে আনা আমার খাবার? কোথায় গেল আমার খাবার? ভেতরে ভেতরে কার সঙ্গে যেন একটা তুমুল তর্ক বেধে গেছে—বাঃ, গেলেই হল খাবার? —

অত কষ্ট করে সাধ করে নিয়ে এলাম!

মাটির দিকে চেয়ে খুব একমনে খুঁজছিলাম। হঠাৎ একবার চোখ তুলতে প্রায় এক রকম আঁতকে উঠলাম, পাহাড়টা যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রথম তাড়সটা কেটে গেলে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি, পাহাড়ের ঠিক মাথায় সবে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় পাহাড়ের ওপরের রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় মনে হচ্ছে, পাহাড়টা যেন খুব কাছে। কিন্তু অন্যমনস্ক হওয়ায় একটা ফল হল, নিজে যে কোথায় রয়েছি জ্ঞান হল। দেখি আলোটাতে আর কিছু নেই, গাঢ় কালির মধ্য দিয়ে একটা ক্ষীণ রাঙা-টকটকে শিখা কোনও রকমে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ গা-টা শিউরে উঠল, হাতে হাত দিয়ে দেখি একেবারে হিম হয়ে গেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঘড়িটাতে দেখি প্রায় একটা, অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুরেছি এই ছটাকখানেক বাড়িটার চারিদিকে।—ঘুরে ঘুরে আবার খুঁজেছি!

শৈলেন একটু চুপ করিয়া সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

তারাপদ বলিল, 'বৃষ্টি দেখছি আজ আর থামবে না।'

সুধেন কহিল, 'তোমায় বাহাদুরি দোব, জ্ঞানটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লে না! প্রায় সেই রকমই হয়, লোকে ভয়ের মধ্যে অনেক সময় ঠিক থাকে, কিন্তু ভয়ের ঝোঁকটা কেটে গেলে যখন দেখে কি অবস্থার মধ্যে ছিল, তখন অনেক সময় আর টাল রাখতে পারে না। অনেক সময় মারা পর্যন্ত যায়।'

শৈলেন ধীরে ধীরে যেন আবিষ্টভাবে বলিল, ''অজ্ঞান তখনও হইনি, তবে কেন যে হইনি, আমার এখনও আশ্চর্য বোধ হয়। ফিরে এসে দেখি, লোকটা বারান্দায় একটা যেন কালো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হল রাগ, বললাম, 'আমি ঘণ্টা তিনেক—।' কি ভেবে কথাটা আর শেষ করলাম না, লোকটা দু'হাতে চোখ রগড়ে, ঘড়ঘড়ে অথচ অত্যন্ত চাপা স্বরে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবু, ঘুমকাতুরে মানুষ—পেলেন না?'

বললাম, 'না।'

'বাসে এনেছিলেন ঠিক মনে আছে?'

আমার রাগটা আরও বেড়ে গেল; হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিতে যাব, তখুনি সম্বিৎ হল—যদি হাত ধরতে গিয়ে শূন্যে মুঠো বাঁধি! কিংবা যদি দেখি,

শুধু একটা মড়ার হাড় মুঠিয়ে ধরেছি। এখন তবুও তো মাঝখানে একটা সন্দেহের ব্যবধান আছে, তখন? নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয় এনেছিলাম।'

বললে, 'আচ্ছা, আপনি ভেতরে যান, নিশ্চয় খুব শীত করছে আপনার।'

আমার ভুল বোধ হয়, কিন্তু মনে হল যেন ঘরে ঢুকে কপাট দুটো ভেজিয়ে সেই অন্ধকারে আলোর শীষটা উসকে দিয়েছি, এইটুকুর মধ্যেই লোকটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। টিফিন কেরিয়ারটি সামনে রেখে দিয়ে বললে, 'এই নিন, হি-হি-হি-হি....'

সেদিন আমি মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতির পরিচয় পাই, ভয়ের চরম অবস্থায় আর ভয় থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, এটা বড় ভীষণ অবস্থা, এটা ঠিক বর্ডারল্যাণ্ড। আর সন্দেহ নেই; বেশ বুঝতে পারছি, হাতখানেক দুরেই প্রেতাত্মা ; তারই সঙ্গে কথা কইছি, বেশ স্পষ্ট দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় পেলে?'

হি-হি-হি করে হাসির সঙ্গে উত্তর হল, 'আপনি যেখানে রেখেছিলেন।'

প্রতি মুহূর্তেই উৎকট ভয়ের এক একটা ঢেউ যেন সমস্ত শরীর তোলপাড় করে ভেঙে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই মরিয়া হয়ে রুক্ষ হয়ে উঠেছি; কেমন যেন একটা নেশা চেপে গেছে—যা স্পষ্ট নয় সত্য, তার সম্মুখীন হতে হবে। একটু রূঢ় স্বরেই বললাম, 'রেখেছিলাম মোটরবাসে, সেটা এখন কিছু নয়তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে আনতে হলে...'

শেষ করতে পারলাম না; নিজের কথাতেই যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে শরীরটা ভেতর থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে!

পঁচিশ-ত্রিশ মাইল!....

এর পর এইটুকু মনে পড়ে যে, হি-হি-হি-হি করে একটা হাসি ক্ষীণ হতে হতে একেবারে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল। আর অল্প একটু মনে পড়ে, বরফের মতো একটা ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শের অনুভূতি।

শৈলেন চুপ করিল, মনে হইল কাহিনীটা বলিতে সে যেন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে তাহার সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিল। এবার বেশ ঘরোয়া কথাবার্তার মতো বলিতে লাগিল, "মাঝে অল্প জ্ঞান হয়েছিল কিনা মনে নেই; তবে একটু ভাল করে যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়েছে, দেখি আমার চারদিকে বেশ একটা ভিড় জমেছে, আমি একটা বড় ঘরে একটা

খাটের ওপর শুয়ে আছি। একজন লোক মাথায়, একজন পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

পায়ের কাছের লোকটির ওপর চোখ পড়তেই চোখ আর ফেরাতে পারি না। লোকটি হি-হি-হি করে হেসে বললে, 'কিছু ভয় নেই বাবু, রাতে অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? আমি না ধরে ফেললে তো পড়েই যেতেন মুখ থুবড়ে।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর হুঁশ হল,—সত্যিই তো, না হয় বেয়াড়া রকম রোগাই, কিন্তু এ মানুষকে অত ভয় পাবার—

তারাপদ ও সুধেন বিস্ময় আর নিরাশায় এক রকম চিৎকার করিয়াই উঠিল, 'মানুষ!'

শৈলেনও ঈজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, 'তবে তোমরা কি ভেবেছ? রোগা আর খাপছাড়া মানুষ মানুষই নয়?'

দু'জনেই কতকটা অপ্রস্তুতভাবে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া শৈলেনের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধেন বলিল, 'আবার ঠকালে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর রং ফলিয়ে গল্প!'

শৈলেন বলিল, 'তোমরা যে রস চেয়েছিলে সেটা পেয়েছ তো? ডাকবাংলোর কীপারেই যদি তা পরিবেশন করতে সক্ষম তো আপত্তি কিসের?'

তারাপদ বলিল, 'বেশ গল্পই যদি, সমালোচনার ধাক্কা সামলাও—মানুষ পঁচিশ মাইল দূরে বাসের ভেতর থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এল কি করে? আর সবই নয় বাদ দিলাম—তোমার মনটা সেদিন ভয়ে খুব high-strung ছিল, সবই তার বিকার!'

শৈলেন ক্রমেই বেশি আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'আনেনি তো অত দূর থেকে!'

'তবে?'

শৈলেন উত্তর করিল, ' সে কথা তো ও লোকটা নিজেই বলে দিলে, আমি যেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।'

'কোথায় রেখেছিলে?'

'মোটর থেকে নামিয়ে রাস্তায়।'

তারাপদ, সুধেন শৈলেনের মুখ থেকে দৃষ্টি নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। শৈলেনের মতো অবস্থায় না পড়িয়াও যে তাহার মতো ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছি, তাহার জন্য বোধ হয় লজ্জিত হইল একটু।

কর্তাবাবুর পেত্নী দেখা

খগেন্দ্রনাথ মিত্র



কর্তাবাবুর অনেক সম্পত্তি, বয়সও অনেক, পাড়ার লোকে খাতিরও করে খুব। বাড়িতে চাকর-বাকর, ঝি-রাঁধুনিও কম নয়। তারা থাকে মস্ত তেতলা বাড়িখানার নিচুতলার অন্ধকার দিকটাতে। আর, তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ থাকেন, মানে ছেলে-মেয়ে, পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী প্রভৃতিদের নিয়ে দোতলা-তেতলা জুড়ে।

সব কালেরই পয়সাওলাদের নাতি-নাতনীরা হয় এক একটা ক্ষুদে নবাবজাদা ও নবাবজাদী। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শখ করে গরিবী চালও চালে। যেমন কর্তবাবুর নাতি তরু, নাতনী অরু। ওরা দু'জনে খুড়তুতো ভাই-বোন। ওদের অনেক বন্ধু-বান্ধবী। তারা কেউ পয়সাওলা, কেউ আধা-পয়সাওলা, কেউ আধা-গরীব, কেউ পুরো গরীব। তরু-অরুদের বাড়িতে তিনখানা মোটর, চারখানা স্কুটার ও তিনখানা বাইসাইকেল। তবু ওরা তাতে চড়ে না, চড়ে ট্রামে-বাসে, ট্যাকসিতে, রিক্‌শয়। দরকার হলে হাঁটতেও পিছপা হয় না। ওরা সবে কলেজে ঢুকেছে। সুতরাং পোশাক-আশাক, চুল-জুলপি যে স্কুলের খোকা-খুকুদের মতো হতে পারে না, তা কি বিশেষ করে বলার দরকার? তাই কখন কখন দু'ভাই-বোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে পিছন থেকে অরুকে মনে হয় তরু, তরুকে

অরু। সকলেরই একটা না একটায় বেশি টান থাকে। ওদের শখ সিনেমা দেখায়, বিশেষ করে হিন্দী সিনেমায়, সিনেমার হিন্দী টপ্পা গানে। এতে দোষের কী থাকতে পারে? দোষের হলে ভারত জুড়ে এমন কাণ্ডই হতো না। গান মানেই হিন্দী টপ্পা!

আর, বুড়ো কর্তবাবুর হয়েছে খাবার দিকে টান। বুড়ো হলে আর পয়সা থাকলে এমনটা হয়ে থাকে। রোজ রকম রকম ব্যঞ্জন, দুধ-ঘি'র খাবার তাঁর চাই-ই। তাঁর জন্যে একটা আলাদা রাঁধুনি আছে। তার তিন কুলে কেউ নেই। গিন্নীমা তিন বছর আগে গঙ্গার ঘাট থেকে তাকে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার' মতো একদিন কুড়িয়ে এনেছেন। মানুষটির মুখে কথা নেই, রাঁধেও ভাল, জানে ও শিখেছেও অনেক। কিন্তু সব দিন টক-নুন-ঝাল সমান হয় না! কর্তা সেদিন খেপে যান, বলেন—'দূর করে দাও। আমার পয়সা সস্তা?'

সত্যি তো! পয়সা খরচ করে শখের খাবার যদি খাওয়া না গেল তবে রাগ হবারই তো কথা। বেচারী রাঁধুনি রান্নাঘরে কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদে।

গিন্নীমা কর্তাকে ঠাণ্ডা করেন। তার চাকরি যায় না।

এখন, কর্তাবাবু বাড়ির মধ্যে দুটি প্রাণীকে বেশি ভালবাসেন। একটি তাঁর শখের কাবুলি বেড়াল—শের খাঁ, আরেকটি তাঁর নাতনী অরু। বেড়ালটা দু'বেলা তাঁর খাবার টেবিলের এক কোণে দেখেও না দেখার ভান করে বসে থাকে; আর দুটি বেলা তিনি ভাল খাবারের খানিকটা তাকে দেন ও খানিকটা অরুর জন্যে রাখেন। বেড়ালটা রুচি থাকলেও রাত্রে অরুর প্রায়ই খাবারে অনিচ্ছা হয়। শুনে কর্তবাবু চিন্তায় পড়েন; বলেন—'ডাক্তার দেখাও। নির্ঘাত ওর অসুখ করেছে।'

কর্তবাবু তো সিনেমা দেখেন না! দেখলে, চোখে পড়তো সিনেমার মতো তার পাশে রেস্তরাঁও 'ফুল'। যেখানে যত রেস্তরাঁ- হোটেল আছে সে সব চলে, আধা-গরীব আর গরীবের পয়সায়। সে পয়সার জোগাড় হয়—না থাক। আর, বড় বড় হোটেল চলে পয়সাওলাদের টাকায়। অরু পয়সাওলার নাতনী হলেও আগেই বলেছি, তার গরিবী চাল, যে গরিবী হঠাতে বহু তক্‌লিফ সইতে ও কথা শুনতে হচ্ছে। তাছাড়া, রেস্তরাঁর চপ-কাটলেট, কষা মাংসের কাছে বাড়ির তৈরি যে কোন খানা মনে হয় ভূষিমাল বা গরুর খাদ্য।

কর্তবাবু যে রাতে পেত্নী দেখলেন, তার আগে রাঁধুনিটা পর পর তিন রাত রান্নায়, পরিবেশনে গড়বড় করে দারুণ ধমক খেলই, বেচারীর চাকরিটিও



গেল। পরদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলে, এবং মাইনে-পত্তর না নিয়ে সে চলে গেল। সকালে উঠে সবাই দেখল, তার খুপরির দরজা হাট, কেবল ছোট পুঁটুলি পড়ে আছে। কর্তা বললেন, 'দেখ কিছু নিয়ে সটকেছে কিনা। পুলিশে ডাইরি করো। ওর ছবি—'

গিন্নীমা বললেন, 'তোমার যেমন আদিখ্যেতার কথা! যার ঘর দোর আছে পুলিশ তারই কিছু করতে পারে না, ওর তো তিনকুলে কেউ নেই। ওর ছবি কী হবে? খবরের কাগজে ছাপাবে? ওই তো পেত্নীর মতো ছিরি। কে ওর ছবি তুলে রেখেছে?'

কর্তা আর কিছু বললেন না।

তার চারদিন পরে সকালের দিকে এক গ্রাম্য কিশোর এসে বললে, 'মাসী পরশু রেতে কলেরায় মরেছে। মরবার সময় বলেছে, তার তিন মাসের মাইনে বাকি, ট্যাকাগুলো দেন? তাই দে তেনার ছেরাদ্দ-শান্তি করতে বলে গেছে।'

শুনে সবাই অবাক! যার তিনকুলে কেউ নেই তার আবার বোনপো এলো কোথা থেকে?

বাড়ির একজন বললে, 'আর বোনপো মানে বুনোকুল—য্যা য্যা--'

কর্তাবাবুর কানে কথাটা উঠতেই তিনি সরকারকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, 'বামনী কদ্দিনের মাইনে পাবে?'

সরকার বললে—'আজ্ঞে এই মাসে মরেছে। এই মাসের সাত দিনের দিন যদি সত্যিই মরে থাকে। গাঁয়ের লোক ভারি মিছে কথা কয়—'

'তোমার বাড়ি কোতা?'

'গাঁয়ে। তবে আমি ঐ সবের জন্যে আর গাঁয়ে যাই নে।'

'বটে! ছোঁড়াটাকে সাত দিনের মাইনে চুকিয়ে বিদেয় করে দাও—'

'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ছেলেটা একটা পয়সাও না নিয়ে চলে গেল। শুনে গিন্নীমা বললেন—'বিষ নেই কুলোপনা চক্কর । না নিবি তো বয়েই গেল!'

পরদিন শনিবার। তিনি গেলেন তারকেশ্বরে বোনঝির বিয়েতে, ফিরবেন পরদিন।

রাত্রে কর্তবাবু খেয়ে-দেয়ে শুয়েছেন। একতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানধারে তাঁর ঘর। আর সিঁড়ির বাঁ-ধারের ঘরে শোয় তাঁর দুই নাতনী অরু ও সরু।

গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণে বাতাস হুহু করে ঘরগুলোতে ঢুকে উত্তরের জানলাগুলো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বাতাসকে কে না ভালবাসে? এমন কি কর্তাবাবুও। তাই শিলিং ফ্যান ঘুরতে থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঘরের দরজা-জানলা খোলা। রাত তখন বারোটার কাছাকাছি—সিনেমার 'নাইট-শো' থেকে দর্শকেরা বাড়ি পৌঁছচ্ছে আর কী!

হঠাৎ কর্তাবাবুর ঘর থেকে রব উঠলো, 'আঁ-আঁ-আঁ—।'

কর্তাবাবু বিছানায় উঠে বসে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত দু'খানা ছড়িয়ে দারুণ ভয়ে চিৎকার করবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু স্বর গলাতেই আটকে গিয়ে কেবল বার হতে লাগল, 'বা-ম-ইঁ-ইঁ-পেঁ-ৎ-হেঁ-হেঁ-ই-আঁ-অঁ-অঁ—।'

এই শব্দ ক্রমেই উচ্চগ্রামে চড়তে লাগলো। তারই সঙ্গে একটি মেয়েলী গলা শোনা যেতে লাগলো, 'ও দাদু, আমি —আমি এসেছি—'

কিন্তু দাদুর মানে কর্তাবাবুর ভয়ার্ত চিৎকার বা গলার স্বর তবু থামে না, বরং আরও বাড়ে। শেষে তা চিরে গেল।

ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সকলেই ছুটে এসেছে—ঘরে-বারান্দায় আলো। তারা

দেখলো কর্তাবাবু বিছানায় বসে দু'হাত ছড়িয়ে হাঁ করে কাঁপছেন, চোখ দুটো কপালে উঠেছে; আর তাঁর সামনে কাঁচের গেলাস হাতে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে অরু।

হৈচৈতে কর্তাবাবুর সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন!

অরুর বাবা জিগ্যেস করলেন, 'বাবা, আপনার কী হয়েছে?'

কর্তাবাবু বললেন, ' দেখলুম বামনীটা এসে মাইনে চাইছে।'

অরু বললে, 'দাদু, বামনী কোথায়? আমি সিনেমা দেখে ফিরে আপনার কুঁজোর ঠাণ্ডা জল খাবো বলে যেই জল গড়াতে গেছি অমনি আপনি উঠে বসে গোঙাতে লাগলেন—এ ঘরে তো আর কাউকে দেখিনি। আপনি কী আমাকে পেত্নী ঠাউরেছেন?'

কর্তাবাবু উত্তর দিলেন না।

তারপর মনে মনে হাসতে হাসতে যে যার মতো নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেল। আলো নিভলো, জ্বলতে লাগলো কেবল কর্তাবাবুর ঘরের আলোটি। তিনি ভূত-পেত্নীতে বিশ্বাসী, তাঁর কথায় বিশ্বাস হলো না।

রাঁধুনির বোনের বাড়ির ঠিকানা না জানায় সরকারকে তার শ্রাদ্ধের দিনে কালীঘাটে গিয়ে তিন মাসের মাইনের পূজো দেবার হুকুম দিলেন।

সরকার মনে মনে খুশি হয়ে বললেন—" যে আজ্ঞে," এবং নির্দিষ্ট দিনে কালীঘাটে গিয়ে নিজের নামে পাঁচ সিকের পুজো দিয়ে এসে কর্তাবাবুকে প্রসাদ দিলে। কর্তাবাবু নিজের ও নাতনীর মাথায় প্রসাদ ঠেকিয়ে তার ও নিজের মুখে কিছু দিলেন। তারপর থেকে কর্তাবাবুর ঘরে আর কখনও পেত্নী ঢুকেছে, এমন কথা শোনা যায় না।



স্বর্ণ ডাইনির গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



স্বর্ণ ডাইনিকে মনে পড়ছে।

শুকনো কাঠির মতো চেহারা। একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, হাটে তরি-তরকারি কিনে গ্রামের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতো। চোখ দুটো ছিল নরুনে-চেরা চোখের মতো ছোট। দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল, কিন্তু ডাইনি শুনে মনে হতো সে চোখ যেন আমার ভেতরে ঢুকে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা খুঁজে ফিরছে।

স্বর্ণ গ্রামে বড় কারোর ঘরে ঢুকতো না। আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমরা স্বর্ণপিসি বলতাম। বেচারি গ্রামের ভদ্রপল্লী থেকে দূরে—জেলেপাড়ার মোড়ে একখানি ঘর বেঁধে বাস করতো। সে-পথে যেতে আসতে দেখেছি, বুড়ি ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে বসে আছে। চুপ করে বসে আছে। কথা বড় কারো সঙ্গে বলতো না। কেউ বললেও তাড়াতাড়ি দু'-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেতো। তার শেষ কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনি। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠতো। কাউকে দেখে চোখে ভাল লাগবে, সে সভয়ে চোখ বন্ধ করতো। দুই ক্ষেত্রেই তার শঙ্কা হতো, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে, হয়তো বা ফেলেছে, বিষাক্ত তীরের মতো তার লোভ গিয়ে ওদের দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না, স্বজন ছিল না। রোগে যন্ত্রণায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে।

ডাইনি স্বর্ণ একাই ছিল না, আরো ছিল। কিন্তু স্বর্ণের মতো অপবাদ কারুর

ছিল না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমার চোখের উপর ভাসছে। জীবনে ভুলতে পারবো না শৈশবের দেখা সে ছবি। ঘটনাটি বলি—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা।—রান্নার কাজ করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'দাদার মা'। তাঁর ছোট ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদেরই বাড়িতে। অবিনাশদাদার উপর ছেলেবেলায় আমার গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আঁকড়ে থাকতাম, স্কুলে যাবার সময় তিনি বিপন্ন হতেন। তিনিও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। একদিন খবর পেলাম, অবিনাশ দাদাকে স্বর্ণ ডাইনি খেয়েছে।

প্রবল জ্বরে অবিনাশদাদা অচেতন। দাদার মা তখন তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন। আমাদের বাড়িতে আর কাজ করেন না, কাজ করে তাঁর বড় মেয়ে, সাতন দিদি। সাতন দিদিই সকালে কাঁদতে কাঁদতে এলো। খবর পাঠানো হলো গোঁসাই-বাবার কাছে। গোঁসাই-বাবা ডাইনে ওঝা ছিলেন। মন্ত্র জানতেন।

গোঁসাই-বাবার সঙ্গে গেলাম দাদার মায়ের বাড়ি। উঠান তখন লোকে লোকারণ্য। সনা ডাইনে খেয়েছে অবিনাশকে, গোঁসাই-বাবা ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার অর্থাৎ মাটির দোতলায় অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। ডাকলে সাড়া নেই। প্রবল জ্বর। মাথার শিয়রে দাদার মা বসে। ও-পাশে বসে অবিনাশদাদার দুই বোন। গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—ভাগ্না! গোঁসাই-বাবাকে দাদার মা 'গোসাই-দাদা' বলে ডাকতেন।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা।

'অবিনাশ!'

অবিনাশদাদা এবার ঘুরে শুলেন। —মর, হাঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে, আমাকে কি বলিস তুই?

'তু কৌন রে?'

চুপ করে রইলেন অবিনাশদাদা।

'কৌন হ্যায় তু?'

'বলবো না।'

'বলবি না?'

'না।'



মন্ত্র পড়া শুরু হলো। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়েন গোঁসাই-বাবা আর মধ্যে ফুঁ দেন—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

অবিনাশ পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলেন, 'বলছি—বলছি—বলছি। ও গোঁসাই, আর মেরো না। বলছি, আমি বলছি।'



'বোল তু কৌন?'

'আমি স্বর্ণ, স্বর্ণ ডাইনি।'

'তু কাহে ইধর? আঁ?'

'আমি একে খেয়েছি যে!'

'খেলি! কাহে—কাহে খেলি?'

'কি করবো? আমার ঘরের সামনে দিয়ে বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।'

'কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে একঠো আম দাও?'

'কি করে বলবো? একে লোভের কথা, তার ওপরে আমি মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।'

'হ্যাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ্।'

'না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বলো না।'

আদেশের সুরে গোঁসাই-বাবা বললেন, 'যা তু, হামি বলছে।'

'না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে স্বর্ণ ডাইনি।'

'না? আচ্ছা। এ দিদি, আন সরষে।'

সরষে এলো। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে—ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন অবিনাশদাদা, 'বাবা রে, মা রে, ওরে মেরে ফেললো রে। ওরে বাবা রে।'



গোঁসাই-বাবা আবার মারলেন সরষের ছিটে।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না।'

'যাবি?'

'হ্যাঁ, যাবো।'

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশদাদা কেঁদে উঠলেন, 'যেতে যে পারছি না।'

'পারছিস নাই? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ?' হাত তুললেন গোঁসাই-বাবা, মারবেন ছিটে। অবিনাশদাদা চিৎকার করলেন আবার, 'না না! যাবো, যাচ্ছি।'

'ঠিক যাবি?'

'হ্যাঁ, যাবো।'

'তব এক কাম কর। ঘরের বাহারে একঠো কলসিমে পানি আছে। দাঁতসে উঠাকে লে যা। নেহি তো—'

'তাই, তাই যাচ্ছি।'

জ্বরে অচেতন অবিনাশদাদা উঠে দাঁড়ালেন। দাদার মা ধরতে গেলেন। গোঁসাই-বাবা বললেন, না। ঘর থেকে অবিনাশদাদা বের হলেন। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসি আগে থেকেই রাখা ছিল; সেটার কানা দাঁতে করে কামড়ে তুলে নিলেন। দাঁতে ধরেই নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামলেন, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, দাঁত থেকে কলসিটা খসে পড়ে গেলো, তিনি নিজেও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটির উপরে—দু'হাতে সাপটে ধরলেন গোঁসাই-বাবা।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেলো। আমার শিশু-চিত্তে ড'ইনি-আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেলো। স্বর্ণ সে দফা মার খেয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পরে তখন আমার বয়স তেরো-চৌদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলো। পান তরকারি নিয়ে আসতো। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসতো এরপর আমাদের বাড়ি, আমার ভয় চলে গেলো। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। অথবা আধো-অন্ধকার দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ। কখনও কথা বলতে সাহস হতো না। কি জানি, স্বর্ণ যদি সেই ডাইনি -মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ করে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে, তোকে দিলাম। তবে আমি ডাইনি হয়ে যাবো! আর স্বর্ণ পাবে জীবন থেকে চিরমুক্তি।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন আমার পিসিমা। আতঙ্কে একরাত্রি ঘুম হয়নি। মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন, 'জানিনে বাবা সত্যি-মিথ্যে কি? তবে ও তোমার এমন অনিষ্ট করবে কেন? স্বর্ণ আমাকে ভালবাসে। তোমাদেরও ভালবাসে। তাছাড়া, কৈ, অবিনাশের ওই ঘটনার পর আর তো স্বর্ণকে দিয়ে কারুর অনিষ্ট হয়নি।'

মোক্তার ভূত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



শিবু-মোক্তার আর বেণী-মোক্তারকে মহকুমার সকলেই চিনত, তাদের মতো ধূর্ত ধড়িবাজ লোক ও তল্লাটে আর ছিল না। লোকে যেমন তাদের চিনত তেমনি ভয়ও করত। একবার তাদের পাল্লায় পড়লে আর কারুর রক্ষে ছিল না—জোঁক যেমন গা থেকে রক্ত শুষে নেয় অথচ জানতে পারা যায় না, তারাও তেমনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে টাকা শুষে মক্কেলকে সর্বস্বান্ত করে দিত।

আদালতে দু'জনের মধ্যে রেষারেষি চলত, আবার বাইরে ভাবও ছিল। কিন্তু শিবু মক্কেলকে বলত, 'বেণীটা জানে কি? ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব।' আবার বেণীও নিজের মক্কেলকে বলত, 'শিবুটা একটা আস্ত গাধা—আইনের প্যাঁচে ফেলে ওর দফা রফা করব।' —কিন্তু সন্ধেবেলা একজন আর একজনের দাওয়ায় বসে তামাক না খেলে রাত্রে ঘুম হত না।

এমনিভাবে দুই মোক্তার সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্ব আর ভিতরে শত্রুতা করে ক্রমে বুড়ো হয়ে এলো। দু'জনেরই বেশ টাকাকড়ি বাড়ি

ঘর হয়েছে—বলতে গেলে তারাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। বারোয়ারী দুর্গাপূজায় এক বছর শিবু প্রেসিডেন্ট হয়, পরের বছর বেণী প্রেসিডেন্ট হয়—স্কুল কমিটিতেও তাই। কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

ওদের দু'জনের মধ্যে বোধ হয় শিবুরই ফিচ্‌লে বুদ্ধি বেশি ছিল। সে একদিন মনে মনে মতলব আঁট্‌লে—বেণীকে ভাল করে ঠকাতে পারেনি, বুদ্ধির যুদ্ধে কখনো বেণী জিতেছে কখনো শিবু জিতেছে। ফলে কেউই বড়াই করে বলতে পারত না যে, আমি বেশি চালাক।

শিবু-মোক্তার ফন্দি ঠিক করে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হন্তদন্ত হয়ে বেণীকে গিয়ে বললে, 'ভাই বেণী, বড় বিপদে পড়েছি, পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পার, কালই ফেরত পাবে।'

বেণী শিবুর মতলব বুঝতে পারলে না, বললে, 'তার আর কি। নিয়ে যাও।'

শিবু টাকা নিয়ে নিজের বাড়িতে গ্যাঁট্‌ হয়ে বসল। পরদিন টাকা ফেরত দেবার কথা, কিন্তু শিবুর দেখা নেই। বেণীর মন উতলা হয়ে উঠল। তারপর আরো দু'দিন কেটে গেল, কিন্তু শিবুর টাকা দেবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

বেণী মহা ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝলে শিবু তাকে বিষম ঠকিয়েছে—কিন্তু লজ্জায় সেকথা কারুর কাছে বলতে পারলে না। হ্যাণ্ডনোটে না লিখিয়ে নিয়ে শিবুকে সে টাকা ধার দিয়েছে একথা জানাজানি হলে দেশসুদ্ধ লোক হাসবে; বলবে—'বেণী-মোক্তারটা গাধা!' শিবুও তাই চায়। বেণী-মোক্তার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল।

শিবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয়, বেণী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'ভাই শিবু, আমার টাকা?'

শিবু হেসে বলে, 'বেণী ভাই, বুড়ো হয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? টাকা আবার আমি কবে নিলুম?'

বেণী রেগে বলে, 'দেবে না তাহলে? আচ্ছা আমিও দেখে নেব।'

শিবু হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, 'বেশ তো, মকদ্দমা কর না, হ্যাণ্ডনোট আছে নিশ্চয়?'

বেণী রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে চলে যায়। ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বেণীর পঞ্চাশ টাকা শিবু-মোক্তার বেবাক ঠকিয়ে নিয়েছে।

সবাই আহ্লাদে আটখানা, ভাবলে—'আহা, কাকের মাংসও কাকে খায়?' বেণীকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—'হ্যাঁ দাদা, তুমি নাকি লেখাপড়া না করেই শিবুকে টাকা ধার দিয়েছিলে? শেষে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল?'

বেণী কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না, ঘাড় নেড়ে বলে, 'আরে না না, ওসব শিবেটার মিথ্যে কথা। দাঁড়াও না, শিবেকে আমি—'

যখন একলা থাকে তখন শিবুর পেজেমির কথা ভেবে দাঁত কড়মড় করে আর গালাগাল দেয়।

এমনিভাবে টাকার কথা ভেবে ভেবে বেণী অসুখে পড়ল। একে বুড়ো বয়স তার উপর টাকার শোক—বেণী যায় যায়। ডাক্তার-বদ্যিরা তার অবস্থা দেখে আশা ছেড়ে দিলে।

বেণী কিন্তু তখনও টাকার আশা ছাড়েনি; কেবলই ভাবছে, কী করে শিবুর কাছে টাকা উদ্ধার করবে! তার আর অন্য চিন্তা নেই। যখন বদ্যি নাড়ী দেখে বললে—'হরি নাম কর! গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! গঙ্গাজল মুখে দাও।' শেষে মরণের আর দেরি নেই দেখে বেণী শিবুকে ডেকে পাঠালে। শিবু এসে তার পাশে বসতেই বেণী আর সকলকে সরে যেতে বললে। সবাই সরে গেলে বেণী কট্‌মট্‌ করে শিবুর দিকে চেয়ে বললে, 'আমার টাকা?'

শিবু মনে মনে হেসে বললে, 'কিছু ভেবো না ভাই বেণী; তোমার টাকা ঠিক আছে। এখন হরি-নাম কর। তোমার ভাল-মন্দ একটা কিছু হলেই তোমার টাকা তোমার ছেলেকে দেব—তুমি নিশ্চিন্তি হয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।'

বেণী বললে, 'না, এখুনি দাও।'

শিবু বললে, 'এখন টাকা কোথায় পাব ভাই? কালই তোমার ছেলের হাতে দিয়ে দেব—তুমি ভেবো না।'

শিবু দেখলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেণী পটল তুলবে, সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকা আনছি।' বলে সে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে শিবু গম্ভীরভাবে বসে রইল। তারপর বেণীর বাড়ি থেকে যখন মড়াকান্না উঠেছে, তখন সে আবার বেণীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। যেন কতই শোক পেয়েছে এমনিভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেণীর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বললে, 'আমি আর বেণী একমন একপ্রাণ ছিলুম; তাই শেষ সময়ে আমাকে দেখবে বলে বেণী ডেকে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল—আমার ছেলে নেহাত ছেলেমানুষ—দেখবার কেউ নেই—

তুমিই দেখাশোনা করো।—তা কিছু ভেবো না বাবা, তোমাদের সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। বেণী আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, তা সে যাক গে, সে টাকা আমি তোমাকে দিলুম। হ্যাণ্ডনোটগুলো আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পাড়া-পড়শী যারা ছিল তারা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—তাইতো! কি আশ্চর্য! শিবুর সঙ্গে বেণীর এত ভালবাসা ছিল?

ক্রমে বিকেল হয়ে আসছিল; পাড়ার অনেক ছেলে-ছোকরা জুটে বেণীর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলল। শিবুও বন্ধুত্বের খাতিরে সঙ্গে গেল। ইচ্ছেটা, বেণীর শেষ দেখে তবে বাড়ি ফিরবে।

গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে যখন সবাই পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয় হয়; পশ্চিমের আকাশে আলো ঝিলমিল করছে। মড়া নামিয়ে ছেলে-ছোকরারা কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু বুড়ো মানুষ, তাই সে মড়া ছুঁয়ে ঘাটেই বসে রইল।

কেউ কোথাও নেই, শিবু একলাটি মড়ার চালি ধরে বসে আছে আর ভাবছে—বেণীকে কি ঠকানোই ঠকিয়েছি, টাকাকে টাকা পেলুম, আবার বেণীটা মরেও গেল। এখন আমি একলাই মোক্তারি করব—আর আমায় পায় কে?

মনের আনন্দে শিবু একটা বিড়ি ধরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে শিবু প্রায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। বেণীর মড়া চালির উপর শুয়ে আছে।

কে চড় মারলে?

শিবু জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছিল, তাই শ্মশানে তার ভয় ছিল না। সে ভাবলে—এ কি হল? তবে কি কোন শকুনি কিম্বা গীধ তার গালে পাখার ঝাপটা মেরে গেল? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? আকাশে তো একটাও পাখি নেই! শিবুর বড়ই ভাবনা হল। সে সতর্কভাবে বসে মড়া পাহারা দিতে লাগল।

শিবু মড়ার পায়ের দিকটাতে বসেছিল, হঠাৎ মড়াটা এক পা তুলে ক্যাৎ করে তার পেটে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার যেমন ছিল তেমনিভাবে শুয়ে রইল। লাথি খেয়ে শিবু 'কোঁক্' করে উঠেছিল, কিন্তু তবু সে সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার মনে হল, বেণীটা নিশ্চয় মরেনি, তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার এই ফন্দি বার করেছে। নইলে মড়া কখনো লাথি মারতে পারে? শিবু বেণীর নাড়ী টিপে দেখল—নাড়ী নেই! —গা বরফের মতন

ঠাণ্ডা। তখন বুকে কান রেখে দেখলে শব্দ হচ্ছে কি না। কিন্তু বুকও একেবারে নিস্তব্ধ।

এই দেখে শিবুর ভীষণ ভয় হল—বেণী যে মরে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং এ বেণীর ভূত না হয়ে যায় না। বেণী যে ভূত হয়েও সেই পঞ্চাশ টাকার কথা ভোলেনি তা বুঝতে পেরে শিবু উঠে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবার যো ছিল কি! যেই সে মড়ার বুক থেকে মাথা তুলতে যাবে, অমনি বেণীর মড়া তড়াক করে চালির উপর উঠে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। শিবু গলা ছাড়াবার জন্যে যতই টানাটানি করে—বেণীর মড়া ততই তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। শেষে সেই শ্মশানের উপর মড়ায়-মানুষে দস্তুরমতো কুস্তি বেধে গেল। এ ওঠে তো ও পড়ে, ও পড়ে তো এ ওঠে। শিবু যেই পালাতে যায় অমনি বেণীর মড়া তাকে লেঙ্গি দিয়ে ফেলে দেয়। শিবু 'বাবারে' 'মারে' 'গেলুম রে' করে চেঁচাতে লাগল আর মড়ার সঙ্গে মারামারি করতে লাগল।

কিন্তু ভূতের সঙ্গে শিবু পারবে কেন? বেণীর মড়া একেবারে নাছোড়বান্দা —কিছুক্ষণ পরেই শিবু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেলে-ছোকরাবা কাঠ জোগাড় করে ফিরছিল, তারা শিবুর চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে যে-দৃশ্য দেখলে তাতে তাদের বুকের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারা দেখলে, বেণীর মড়া আর শিবু চালির উপর পাশাপাশি গলা জড়াজড়ি করে বসে আছে। মড়ার মুখ বিন্দুমাত্র বিকৃতি নেই, তার একটা হাত সাঁড়াশির মতন শিবুর গলাটি জড়িয়ে আছে। শিবুর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে, সে মাঝে মাঝে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পালাতে পারছে না—বসে পড়ে ঠক্ ঠক্ কাঁপছে।

শিবুর ছেলেও এসেছিল, তাকে দেখে শিবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল— 'ওরে বাবা, শিগ্‌গির বাড়ি যা! পঞ্চাশটা টাকা বেণীর বৌয়ের হাতে দিয়ে আয়গে যা, নইলে আমাকে ছাড়বে না।'

শিবুর ছেলে বাপের অবস্থা দেখে বাড়ি দৌড়ল। আর সকলে আলো জ্বেলে চালি ঘিরে বসে রইল। পোড়াবার উপায় নেই, পোড়াতে হলে দুই মোক্তারকে একসঙ্গে পোড়াতে হয়। কারণ, বেণীর মড়া তখনো শিবুর গলা জাপটে ধরে বসে আছে।



কলকাতার গলিতে

প্রেমেন্দ্র মিত্র



বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুপুররাত্রে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ানো কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু'পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাস লাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নেই বল্লেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল।

বিশ্বনাথ বলে, 'না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরুনো নিরাপদ না।'

আমরা হেসে উঠলে বলে, 'না হে না, চৌরঙ্গি, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গি নয়। শোন তাহলে—

'সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরির জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাত্রের ট্রেনে বাড়ি চলে আসব। কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ থিয়েটার না দেখে সেমন করে ফেরা যায়। প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেল্লাম। সঙ্গে বিছানাপত্রের বা তোরঙ্গ-বাক্সের ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটি সুটকেস, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে

সোজা শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হ'ত।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হল, একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। স্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশিদিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে—কোনও কাজে বেশিদিন লেগে থাকবার মত ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ুউড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। বড় হয়েও তার সে স্বভাব কাটেনি। কথা নেই, বার্তা নেই— হঠাৎ একদিন হয়ত আমরা শুনলাম অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়তো দু'মাস তার দেখা নেই। আমরা কোন রকমে প্রক্সি দিয়ে হয়ত সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম, কিন্তু এমন করে কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এক্‌জামিনেশনের সময় দেখা গেল অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কম দিন এসেছে যে তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে মিশুকে ছিল যে আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হল। বল্লে, 'তবে আর কি? ভাই, বর্মাটা একবার ঘুরে আসি।'

তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই। আমাদের চেয়ে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড় এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশা আর মিটতে চাইত না। যেসব দেশ সে এখনো দেখেনি তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে আমাদেরও কখনও কখনও মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হত এই ছোট্ট শহরের ছোট্ট জানা কটি রাস্তায় দুবেলা যাওয়া আসায় জীবনের কোন সার্থকতাই নেই,—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বড় করে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

কিন্তু আমাদের এই ক্ষণিক মোহ অবশেষে খানিক বাদেই কেটে যেত, কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশের একটা

চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে, অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতায় এই ঠিকানায় আপাততঃ আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়ত যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু গলিটা মনে ছিল। ভাবলাম কলেজ স্ট্রিট থেকে বেশি দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই, যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর একটা গলিরাস্তায় ঢুকে একজনাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশি নয়। বড়জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূর হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক আর যাই হোক, কলকাতার পথ ত বটে। অথচ এই আটটা রাত্রে সেখানে একটি জনপ্রাণি নেই।

ভেবেছিলাম খানিকদূর গিয়ে আবার কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হল, হয়ত ভুলপথে এসেছি। কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে, আমার ভুল পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি এমন লাখ পঞ্চাশ টাকা আছে যে চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখে বড়লোক বলে ভুল করবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে? আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন, বাতিগুলোও কি এ পথের মিটমিটে হতে হয়! একে গ্যাস-পোষ্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে, তার ওপর কি কারণে জানি না আলো তাদের এত ক্ষীণ যে রাস্তা আলো হাওয়া দূরের কথা, সেগুলো জ্বলছে বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস্ কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা আছে কে জানত। দুপাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরি। কোনও রকমে হাড়-বেরুনো ইট-কাঠের জীর্ণ দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোন বাড়িতে একটা আলো, না জনমানুষের একটু শব্দ। সে রাস্তার পাশে সারের পর সার পোড়ো বাড়ির মত সব খাঁ-খাঁ করছে।

ক্রমশঃ মনে হল একটা কেমন যেন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস যেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটায় ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল, কিছু দূর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে। কিন্তু জনমানুষহীন জীর্ণ বাড়ির সারের ভেতর ডাইনে-বাঁয়ে কোথাও কোনও পথ নেই।

সামনের পথও খানিক দূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে পথে ঢুকেছি, গলিটার ওই একটি মাত্রই পথ তাহলে বেরুবার রাস্তা! আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল পথ দেখাল কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল, তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই, কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গা-টা কেমন ছম্‌ছম করছিল।

সবে তো প্রথম রাত। কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে গাড়িঘোড়ায় মানুষের শব্দে গম্‌গম্‌ করছে। অথচ এই পথটা কেমন করে এখন নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল! মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি, কেউ যেন জানে না। আমিও যেন প্রথম সে শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলাম। খট্‌খট্‌খট্‌—আমার নিজের পায়ের শব্দ অদ্ভুত ভাবে নির্জন অন্ধকার বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই কটা রাস্তার বাতি দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশঃ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। না, এ গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিকদূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকেও গলির পথ যে বন্ধ। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি, এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। এ গলি দিয়ে এগুবার সময়ে

আশপাশে কোনও পথই দেখতে পাইনি। তা হলে গলির দু'মুখ বন্ধ কেমন করে হয়?

ভাবলাম, হয়ত আরো একটা পথ ছিল। যাবার সময় আমার দৃষ্টি কোন রকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল করে সেইটিতেই ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে? আমি অন্যমনস্ক হয়ে ত ছিলাম না। আগাগোড়াই ত সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতে যদি একটা আলো দেখা যেত! না হয় ডেকেই জিজ্ঞাসা করতাম!

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশঃ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তেই কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারও যখন দেখলাম গলির মুখ বন্ধ, তখন সত্যই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। ফাঁকা আকাশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি। শহরে এলে অমনিই আমাদের হাঁফ ধরে। তার উপর এই ভ্যাপসা গন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন আমাকে জেলখানার মত বন্দি করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাবো তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যত এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাবছিলাম, মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেসটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই তো বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না? তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম—এই তো আমাদের অবিনাশ! এতক্ষণের ভয়-ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকতেই সে চমকে তাকাল। বল্লাম, 'কী আশ্চর্য, তোর খোঁজ করতেই এই এক ঘণ্টা এই গলির

ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে! বাবা, কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্ তুই! ঢুকে আর বেরুনো যায় না!’

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে, ‘এসেছিস্ তাহলে ঠিক!’

বল্লাম, ‘এসেছি আর কই, তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম!’

সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, ‘আমায় তা হলে তোর মনে আছে ভাই!’

‘মনে থাকবে না কেন রে?’

‘না ভাই, মনে থাকে না। অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে তার ভেতরই আমরা বেঁচে থাকি।’

আমি হেসে বললাম, ‘ছিলি ত ভূপর্যটক, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।’

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বল্লে, ‘আমার বাড়ি! আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি?’

‘হ্যাঁ, সে ত তিন মাসে আগে!’

‘তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।’

‘আবার! তা হলে ফির্লি কবে?’

অন্যমনস্কভাবে অবিনাশ বল্লে, ‘এই আজ।’

‘এই আজ? এবারে গেছলি কোথায়?’

‘বলছি চল।’



সেই নির্জন গলি দিয়েই তখন আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল, ‘এবারে ভাই গেছলুম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরানো। নোনাজল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরানো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয়, বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তা চেহারাতেই কেমন একটা ভবঘুরে রুক্ষুরুক্ষু ভাব। সেইটিই

তার সৌন্দর্য। তার ওপর শুনলাম যে এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে—তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাস আর জঙ্গলের মসলাগাছের গন্ধ। তার উপর গভীর বনের মাঝে তার বোরাবুদর।

একেবারে মেতে উঠলাম, যেমন করেই হোক যেতেই হবে জাহাজে। জাহাজের ভাড়া দেবার পয়সা নেই। অনেক কষ্টে জাহাজের হেড-খালাসিকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে ছোট তেরপল-ঢাকা বোট টাঙ্গানো থাকে। ঠিক হল তারই একটির ভেতর আমি থাক্‌বো। কেউ তাহলে টের পাবে না। খালাসি কোন এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমার খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভিতরে গিয়ে হেড্‌-খালাসির নির্দেশমত লুকিয়ে রইলাম। ভোর হবার আগে জাহাজ ছেড়ে দিল।

তারপর কদিন কি অদ্ভুত ভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি, তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতের যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কজন ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান আর ওপরে হাল ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিঙ্‌ ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে কদিন বাদে জাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল, সবাই নেমে গেলে কোনও এক সময় হেড্‌-খালাসি আমার নামার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার আগের রাত্রে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে তা হবার উপায় নেই। এখানে মাল নামানো হলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই ডকে রং করবার জন্যে পাঠানো হবে ঠিক আছে, সুতরাং সেভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? খালাসি বল্লে, উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়াবার সময়ে সেই কাজে ব্যস্ত থাকবে তখৰ যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি তাহলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম!

জাহাজ জেটিতে লাগবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠে বাঁধাই ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টোদিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখতেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়াবার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাডেলের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল, কি ভীষণ তার টান! প্রাণপণেও আর সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণ্যমান ভয়ঙ্কর প্যাডেলে ধাক্কা খেয়ে তলার দিকে তলিয়ে গেলাম।'

আমি শিউড়ে উঠে বল্লাম—'তারপর?'

'তারপর সেই প্যাডেলের ঘা! কি ভয়ঙ্কর লেগেছে দেখবি?'

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনও জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামা তুলে দেখালে।

একি! জামার নিচে যে কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, শূন্য!

ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই; ওধারে গ্যাসপোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম, সেখানে অবিনাশের মাথা নেই—শূন্য শূন্য সব শূন্য।

অস্ফুট চীৎকার করে সুটকেস হাতে আমি দৌড়াতে সুরু করলাম, কিন্তু কোথায় যাব? যেদিকে যাই, নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চীৎকার করে একটা পোড়োবাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরে-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। কিন্তু কারুর সাড়া নেই। অন্ধকার। গলি মনে হয় আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভ্যাপসা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি কে একজন আমায় বলছে, 'উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা স্টেশন হ্যায়।'

শিয়ালদা স্টেশন্‌! অবাক হয়ে দেখি, আমি আমার সুটকেস সমেত একটা রিকশ'য় বসে আছি। সামনে শিয়ালদা স্টেশন। নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিকশ' উঠেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না। হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি—অবিনাশ দু'মাস আগে জাভার বন্দরে অমনি করে মারা গেছল।

এক রাত্রির অতিথি



গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগে চুপ করেছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ—এমন কি ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল এইটেই পেশা। ওর বৌ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না—ছোট জামাইটা জুয়াড়ী, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলেবয়েসে একবার ও কলকাতা গিয়েছিল কিন্তু অত হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে কেবলমাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই বুঝেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করে নি। বাস তো নেই-ই, আশেপাশে কোথাও মানব-বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকা এসে যেখানটায় ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মতো একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত। সেই মাচাতে নেমে অসহায় ভাবে অনিমেষ একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। নিচে ময়ূরাক্ষীর কালো জল

নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটু প্রাণস্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ—যে মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ি ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তা সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না, কিন্তু তারই অসংখ্য শাখাপল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। একটা আলোর রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ওপারেই যদি এই হয় তো, এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এপারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলাও কোনও গ্রাম ওর চোখে পড়ে নি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবাই ভগীরথপুর চলে যায়। সেদিন অন্তত এমন কেউ ছিল না যে এপারে কোথাও যাবে। আসার সময়ও দুদিকে আমগাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ি, কিন্তু তা ওর চোখে পড়ে নি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকো আছে, চওড়া ভেলার মতো প্রকাণ্ড বস্তু-কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ি চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

'বাবু ভাড়াটা?'—তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

'ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব? তুই তো এক ঘণ্টার রাস্তা সাত ঘণ্টায় এনে আমাকে এই বিপদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাই কিনা, এপারে এই জঙ্গলে শেষ কি বাঘের পেটে প্রাণ দেব! চল, ওপারে নিয়ে চল্—'

'উটি লারল্ম আজ্ঞা!'

'সে কি! কেন রে? কী হয়েছে?'



তার উত্তরে মাঝি যা বললো তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিসে ধরিয়ে দেয়। সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক ক'রে বোঝাল। ওপারে তাকে ধরবার জন্য ইজাদার যদি বসে থাকত তো অনিমেষ তাকেই ডাকত; শুধু ইজারাদার কেন, জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোনমতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক্—তাতে যদি কেউ তাকে ধরে তো অনিমেষ তার দায়ী —ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর, 'উটি লারলম্ আজ্ঞা !'

অনিমেষ তখন রাগ করে বলল, 'তবে তুইও থাক্, আমি তোর নৌকোতেই রাত কাটাই।'

'আজ্ঞা, উটিও লারলম্!' শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'টাকাটি ছুঁড়ে দ্যান্ কেনে—বাড়ি চলে যাই।'

'তবে টাকাও পাবি না যা!' রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি-সত্যিই একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা একটাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

'যা বেটা যা। পথে ডুবে মরিস তো ঠিক হয়।' মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস, এরপর সব পরিস্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় তমিস্রা, সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য যেন জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চারপাশ ঘিরেও দৈত্যের মতো কতকগুলি গাছপালা, ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন, এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। ব্যস্ এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর।

স্যুটকেসটা মাচার উপর পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভল্লুক যদি সত্যিই আসে তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর্ খর্ ঝট পট শব্দ করে কী একটা পাখি উড়ে বসল মাথার ওপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। কাছেই কোথাও শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কী একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ, তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজি খায়। ঐটুকু আওয়াজ—কিন্তু অনিমেষের মনে হ'ল যেন বন্দুকের শব্দ উঠল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে ধরে হাতঘড়িটা দেখল—মাত্র রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনও দীর্ঘসময় তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনও—

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর গ্রাম একটা পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে?

কিন্তু সেখানে যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায় ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দু'দিকে যা ঘন ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এসব অঞ্চলে প্রায়ই বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ-এগারো ঘণ্টা সময়—একরকম করে কেটেই যাবে। 'ও মশাই, শুনছেন? বাস মিস্ করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?'

অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে চম্‌কে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁৎকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—কৈ একটুও তো টের পায় নি! সামান্য কুটো নড়ার শব্দের দিকেও তো সে কান পেতে ছিল!

কয়েক মুহূর্ত যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, ঘাড় ফেরাতেও সাহস হয় না। কথাগুলো বলেছে সে একেবারে ওর পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এইভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন ক'রে আগন্তুকটিও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটি মানুষ, খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙাও বলা চলে না। উস্‌কো-খুসকো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়িগোঁফ। ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা হয়—এমনি দাঁড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিঃশব্দে শুধুমাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে।.....

'বলছিলুম যে, আপনি বোধহয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তাহ'লে বরং চলুন না-হয় আমার কুটিরেই—কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।'

হায়রে! আগুন্‌ফলম্বিত-কুন্তলা বনমালা-শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা যায়!

যাক্ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই! এ লোকটাকে দেখেই যেন পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরও বিপদে পড়বে!

'কী বলেন? যাবেন নাকি?'

'আ-আপনি এখানে—মানে—' আমতা আমতা ক'রে অনিমেষ।

'আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে!'

লোকটা আঙুল দিয়ে দেখায়।

সত্যিই তো, এই তো, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর—ও অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, 'ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পান নি। আমিও বাড়ি ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।'

'এখানে বাঘের ভয় নেই?'

'আছে বৈকি। তবে আমার অত ভয় নেই।.....মরবার ভয় করি না। করে লাভই বা কি বলুন, মরতে তো একদিন হবেই।'

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে তো মনে হয় না!

'চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্তা হবে'খন।' লোকটা তাড়া লাগায়।

'চলুন' বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—পাশাপাশি দুখানা ছোট ঘর, সামনে এক ফালি দাওয়া। ভেতরদিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। দাওয়া বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন। লোকটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে 'দাঁড়ান আলো জ্বালি' বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকল। তালাচাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বলল, 'আসুন—ভেতরে আসুন।'

ঘরে আসবাবপত্র বেশি ছিল না। একটি তক্তপোশের ওপর একটা মাদুর বিছানো, —শয্যা বলতে এই। একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একপাশে একটি দড়ি টাঙানো, তাতে খান-দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল—মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটা কাঁসার ঘটি এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

'বসুন, বসুন। ঐ চৌকিটের ওপরই বসুন।'

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুইহাত ঘষে কেমন এক রকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, 'ভাল বিছানা আমার নেই। ঐ স্যুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে।.....আর খাবারও তো কিছু দিতে পারব না। ঘরে আমার কিছুই নেই।....আপনি মদ খান?'

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে।

'না-না। রক্ষে করুন। কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।'

'ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ-ভাল্লুকের হাত থেকে তো বাঁচলেন অন্তত। —তা আশ্রয় ভালই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন?'

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক্ করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে —পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি?

'আপনি এখানে কী করেন?'

'আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন, আমি আসি। মুখহাত ধোবেন নাকি?

ধুতে পারলে ভালই হ'ত, কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না। সে বললে, 'না—দরকার নেই।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন? ঘরে কোনও রকম কিছু খাবার নেই তো ও নিজে খায় কি? চোরডাকাত নয় তো? লোকজনকে ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন—ব্যাগে ওর খানকতক পুরোনো কাপড়জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা ছয়েক আছে। কিন্তু একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে....এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে, টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা-ছাড়া মেরে ফেলে তো দেখবে কী আছে না আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটা লোককে খুন করার পর পেয়েছিল মাত্র একটি আধলা!

কখন গৃহস্বামী আবার নিশব্দে ওব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, অনিমেষ টেরও পায় নি। যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে । আশ্চর্য!

লোকটি বলল, 'এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি। কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাই নি! বলেন তো দুটো কথা কয়ে বাঁচি।...এখানে তেমন লোকজন তো নেই, আসেও না কেউ—'

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানল, 'তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন? '

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তের সেই বিজলী প্রকাশ!

'ভয় নেই—আমি চোর ডাকাতও নই, পাগলও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই। থাকারও দরকার হয় না আমার। কেন জানেন?'

তারপর যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, 'আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, 'না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।'

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বললে, 'তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলি নি, বলবার সুযোগও পাই নি বিশেষ। এই অঞ্চলেরই লোক আমি, বুঝলেন? ছেলেবেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐদিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হ'ত আমিও ঐসব সাধনা করে সিদ্ধ হবো, তারপর প্রাণভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য ভোগ করব—আর আমাকে পায় কে! হায় রে, তখন কি আর জানতুম যে ভোগের উদ্দেশ্যে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা, সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে!'

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণে অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তায় সত্য কতা বলছে বলে মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

'বাড়ি আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ি সেই পাঁচথুপির কাছে। এখানে কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান।.....বলেছি আপনাকে, ছেলেবেলা থেকেই ঐদিকে ঝোঁক গিয়েছিল। ইস্কুলের পড়া হ'ল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ? দু-একটা সন্ন্যাসী যা হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি ক'রে? ......মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল—জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমি বকুনিও খেয়েছি ঢের কাজকর্ম কিছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখি নি।'

'তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষমেষ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ি থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।......এ তীর্থ ও

তীর্থ ক'রে অনেক দেশই ঘুরলুম। ভাল চাকরি বা ভাল বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম; সংসার—বুঝলেন মশাই, মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারল না। কিন্তু আসল যা উদ্দেশ্য তাও কিছু হ'ল না।.....এমনি ভাবে যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি তখন একদিন —বাড়ি ফেরার পথে বলতে গেলে—বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনলুম, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচা মাংস, পাতালতা এমন কি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।'

'খোঁজ ক'রে গেলুম। প্রথম তা দেখাই পাওয়া যায় না। শেষে তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মতো ভাবভঙ্গি—কিন্তু পাগল নন। একদিন আমার চোখের সামনেই —দু'দিক থেকে দু'দল ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে আসছে দেখে, আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন,, কেউ আর খুঁজেই পেল না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিলুম, এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।'

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, 'তারপর?'

'লোক তো পেলুম—তাকে ধরি কী করে? কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে —বললে, ভাল চাস্ তো এসব মতলব ছাড়! সাধনা করবি তুই, ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্যে এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল দুকূল যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প পড়িস নি? মাকে বলেছিল, মা অষ্ট সিদ্ধাই দে—হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐদিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে তো এই মারে! বুঝলি —এমনি তুচ্ছ শুধু নয়, ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে-থা কর। নিজে-নিজেই ভগবানকে ডাক্, নয়তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস্। অনেক কাকুতি মিনতি করলুম, বাবার আর দয়া হ'ল না। আমি কিন্তু মশাই হাল

ছাড়লুম না। আমার তখন জেদ চেপে গেছে কি না। ....ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে দেয়ে—আর গোপনে ওঁর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিস পাই—বুঝলেন না? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি! আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি। তারপর হ'ল কি মশাই, আরও দু-একজন সাধক আর ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি তো ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি ক'রে?....পরপর কদিন ওঁদের চক্র বসল। তাও দেখলুম। —মনে হ'ল যে,আর কি, সব শিখে গেছি.....ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ি ফিরলুম না, নির্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে এই রকম খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লুম। পথে নলহাটিতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে নিলুম।

'ও মশাই, এলুম তো এখানে,কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ নেই—শেষে অনেক কৌশল ক'রে অনেক নিচে নেমে যদি বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন করে বসেছি—কী বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি তো এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধুই পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও তো সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয়, তবে ভয় পেলেন কেন?

হাসল লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষি করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষেরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, 'জানে তো সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হ'লে বুঝতেন!...শুনবেন কেমন?....মড়ার খুলিতে ক'রে মদ খাচ্ছি—মনে ভয়ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সে সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হ'ল ফিস্‌ফিস্ কথার শব্দ, খিলখিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেইটাই বাড়তে লাগল। মনে হ'ল দশজন, বিশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চারপাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্‌ফিস্ কথারই শব্দ হ'তে থাকে তো কেমন হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের খিলখিল হাসি। তবু আমি স্থির হয়ে আসনেই বসে রইলুম—নড়লুম না। যদিও কাজে আর মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক। তার পর মশাই—স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব—কত হাজার হাজার বছর ধরে। এক এক

জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায়-দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে—তেমনি স্কন্দকাটা কিংবা হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ, চোখের দৃষ্টিতে আগুন। তারা সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে লাগল, পাপিষ্ঠ, তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস? চলে যা, তার মধ্যে একজনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে—তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে।.... সেটাই সবচেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই এক শব্দ দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব, তবু এও জানি, একবার ভয় পেলেই গেল—চিরকালের মতো। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাবো না, যাবো না। উঠব না আমি। ব্যস্ —আর যায় কোথা, সেই কঙ্কালটা আরও এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ , সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী! কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার, কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য! দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা—মনে হ'ল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে।....আকুলিবিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে—সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না। বরং আরও চেপে বসতে লাগল সেই সাঁড়াশীর মতো আঙুলগুলো--।.....'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'তারপর?' আবার সেই হাসি, 'তারপর আর কি,মুক্তি! সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই। কাজ নেই, কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারি নে।.....সব চেয়ে কষ্ট হয়, কথা কইবার লোক নেই বলেই—'

'—কি—কিন্তু....' কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের যেন গলা কেঁপে যায়, 'আপনি মুক্তি পেলেন কি ক'রে?'

'তা আমিও জানি না। এক সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ কিনা দেহটার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও তো কাজ শেষ, তারাও সব যে-যার মিলিয়ে গেছে। এককথায় সব কিছুর শান্তি।'

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরি লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, 'তার -তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মা--মারা গেলেন? আ—আপনি কি মড়া?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মতো চীৎকারে পরিসমাপ্ত হয়।



কিন্তু প্রশ্ন সে করছে কাকে ? কেউ তো নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিসগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উবু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে?

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠ'তে লাগল কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, তাহ'লে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি! ও লোকটা মানুষ নয় অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবার কিছু লাগে না ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই!

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান-পড়া ছেলে। এসব মিথ্যা—কল্পনা, আত্ম সম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করবে না এ কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখছে!

আচ্ছা, পিছনে ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যিই কি—? না লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করেছে? আগে যা ভেবেছিল

তাই? ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়ে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল, এর পর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে!

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হ'লে আলোয় থাকবে কি করে?.....বদমাইশ! আরও বেশি ভয় দেখাবার জন্য ম্যাজিকওয়ালাদের মতো চোখের নিমেষে সরে গেছে।



দোরটা বন্ধ ক'রে দেবে নাকি দেওয়াই উচিত।

পালাবে?

কোথায় যাবে এই অন্ধকারে! আরও তো ওদের কবলে গিয়েই পড়তে হবে। সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে, আলো তো থাকবে এখানে। লোকগুলোকে চোখে দেখা যাবে!

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোনও-মতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভেতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখেশুনে ভাল ক'রে বন্ধ করল। যাক্, নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী? হঠাৎ আলো নিভে গেল যে! মুহূর্তের মধ্যে, কোনরকম নোটিশ না দিয়েই—ঘরটা তার চারপাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তাহলে তো একটু একটু ক'রে ম্লান হয়ে আসবে—

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল—তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়ত তক্তপোশের নিচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেখানেই লুকিয়ে ছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয়ই তাই। কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল! ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটেতে দেশলাই পর্যন্ত নেই। যতদূর মনে পড়ে ব্যাগও নেই! ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে, তাও তো মনে পড়ছে না!

উঃ—কী বদমাইশ লোকটা!

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ বলে উঠল, ' কে? কে ওখানে? আলো জ্বালো বলছি শিগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা! কি, জ্বাললে না?'

নিস্তব্ধ চারিদিকে। কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না।

রহস্যময় সুগভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানলা ছিল? তাও তো মনে পড়ছে না ছাই! জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে। অনেক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই তো দেওয়াল, হাতড়ে দেখতে দোষ কি?

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে, আচ্ছা বোকা তো সে! দোরটাই তো রয়েছে, খুলে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়! ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভাল, তারার আলো আছে। ব্যাগটা? থাকগে, প্রাণ তো বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এই মাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়াল। কৈ সে দরজা? অথচ—ও তো সবে বন্ধ করে এপাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে!

তবে কি ও দিক্‌ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু তো ঘর, দেওয়াল পেলে, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে! কিন্তু উপায়ই বগা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েছিই—

মরিয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।....এক দুই ......একি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল! ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয়, দশ-বারো ফুটের বেশি হবে না লম্বায়, নেহাতই ছোট্ট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনেরো ফুট!

আরও দু পা....আরও দশ—আরও কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে নাকি?

কী রকম হ'ল? চল্লিশ পা চলার মতো ঘর তো নয়! কোণাকুণি হাঁটছে? তাতেই বা এতদূর হবে কেমন ক'রে? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময়, অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা। বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয় নি এবার তাই হ'ল, পা দুটো কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে।.....'একেবারে যেন ভেঙে এল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হ'ল? কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে? তবে কি সে লোকটা

অশরীরী—সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহ'লে কোনও প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে? বিহুল হয়ে অনিমেষ কি করবে, কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ তো কত লোকের পায়ের আওয়াজ! অন্তত আটদশ জনের কম নয়। কিংবা আরো বেশি। এই বাড়ির কাছেই আসছে, ঐ তো দাওয়ায় উঠল।

'ও মশাই, শুনছেন? ও মশাই—'

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাক্‌রা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি সেই ডাকাতের দল হয়? তা হোক্, তবু তো তারা মানুষ। ভরসা হ'ল একটু অনিমেষের। তাহলে অন্তত এটা প্রেতের মায়া নয়। আঃ—বাঁচা গেল! হ্যাঁ—ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবে কেন? বহুলোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। আরও লোক বাড়ছে। আরও বহু পায়ের শব্দ, অসংখ্য, অগণিত ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলার আওয়াজ—

একি—ওরা কি ঘরে ঢুকছে নাকি?

কেমন ক'রে ঢুকল?

ওর যে চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে! ওরই চারপাশে, খুব কাছে! খিল খিল ক'রে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় যেন দেহের মধ্যে। হাত-পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্ক সুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে....

চীৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ? কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ, নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে......

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও তো এমনি ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান সেই কঙ্কালের অভিযান!

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ করে নি। সে তো সাধনা করতে আসে নি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলার সে হাসি, মেনে হ'ল যেন তার পাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ

করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই এক হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারিদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই—

প্রাণপণ চেষ্টায় মরীয়ার মতো চীৎকার ক'রে উঠল একবার অনিমেষ, ' হে ভগবান, এ কী করলে!'

সত্যিই তো। ভগবানের কথা তো তার মনে ছিল না। তাঁকে তো সে ডাকে নি।

'হে ভগবান, হে হরি, বাঁচাও—হে রামচন্দ্র! ' আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হ্যাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?.....

সুগভীর ক্লান্তি আর অসহ্য তন্দ্রায় চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে তার।

ঘুম যখন ভাঙল অনিমেষের, তখনও সকাল হয় নি কিন্তু ফরসা হয়েছে একটু। খানিকটা সময় লাগল তার সবটা মনে করতে, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাল ক'রে চেয়ে দেখল যে সে বাস দাঁড়াবারই ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে ঘুমিয়েছে কখন—স্যুটকেসটা খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় পড়ে আছে।......আরে—সে ঘর! সে ঘরটা কোথায় গেল? যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কোনও ঘরের চিহ্নমাত্রও তো নেই! সে কি বাস থেকে নেমে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল? তাই হবে হয়ত। হয়ত সবটাই ওর স্বপ্ন।.....

সে উঠে নদীতে গেল মুখ-হাত ধুতে।



অনুপাতের উৎপাত

লীলা মজুমদার



এ—ও গজখুড়োর মুখে শোনা।

বটুকদাদুর পৈতৃক বাড়ির মতো আরেকটা বাড়ি শুধু ভূ-ভারতে কেন, দুনিয়াতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ওপরের রাস্তায় সদর ফটক, সেখান থেকে মনে হয় একতলা বাড়ি। আবার ঐ রাস্তাটাই একটা পাক খেয়ে যখন বাড়ির পেছন দিয়ে নিচে হিঞ্চে বাজারের দিকে নামতে থাকে, সেখান থেকে দেখলে বোঝা যায় আসলে তিনতলা বাড়ি। নিচের দুটো তলা পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে হিমালয়মুখো দাঁড়িয়ে আছে।

এর আগে ন্যাকা-বোকা যায়নি কখনো ওখানে। তবে বটুকদাকে আলু—কাবলি কিম্বা চানাচুর খাওয়ালে, ঐ বাড়ির সম্বন্ধে যে—সব রোমাঞ্চকর গল্প বলত, তাই শুনে ওরা তাজ্জব বনে যেত। সব গল্পের কেন্দ্রে একজন রহস্যময় লোকই থাকতেন। তিনি ওদের ছোটদাদু—যিনি প্রায় ২০ বছর নিঁখোজ।

বটুকদা বলেছিল যে, এতকাল যাঁর টিকির দেখা কেউ পায়নি, তাঁকে জলজ্যান্ত ধরে দেওয়া ন্যাকা-বোকা ছাড়া আর কারো কম্ম নয়। যারা স্রেফ

দড়ির ফাঁস পরিয়ে টপাটপ দুটো ধেড়ে বাঁদর ধরে ফেলতে পারে, তাদের কাছে এ তো ছেলেখেলা। বটুকদার বড় নানি নাকি পই—পই করে তাকে বলে দিয়েছেন, এ বছর পূজোর ছুটিতে ওদের দুজনকে যেন অতি অবশ্য বটুক নিয়ে যায়। নইলে বটুকেরো গিয়ে কাজ নেই।

শুনে ন্যাকা-বোকা থ'! অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন ওদের আগমন ঠেকাবার চেষ্টাই করে। এ আবার কেমনধারা উল্টো কথা! তাছাড়া যিনি ২০ বছর নিখোঁজ তিনি কি আর আছেন?

বটুকদা টেবিল চাপড়ে বলল, 'আছেন বৈকি। নইলে বছরে ডাকযোগে বড় নানির নামে বেনামে ঐ বাড়ির ট্যাক্সের টাকা পাঠায় কে? আছেন ঠিকই। তবে হয়তো অন্তরীক্ষ থেকে ধরে আনতে হতে পারে। তোমার কাছে সে আর এমন কি? ও বাড়ির ছাদে রোলারস্কেটের ব্যবস্থা আছে তা জানিস? আর দোতলায় ঘোরানো দূরবীণ।

আর বলতে হলো না। ন্যাকা-বোকা এক কথাতেই রাজি। কে ওদের কবে বা কোথায় রোলার—স্কেট করাচ্ছে? বাড়ির লোকেও তিন সপ্তাহ ওদের চেহারা দেখতে হবে না শুনে, সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি এবং খরচাপাতি দিয়ে দিল। বটুকদারা তো আর ওদের পর নয়। বটুকদার বড় দাদুর মা আর ন্যাকা—বোকার ধামুর মা নাকি মাস্তুতো বোন ছিলেন। ধামু মহা খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাবি নিশ্চয়। আমাদের সব কুশল জানিয়ে আসবি, আর সেই ফাঁকে আমার আচর গুলোকে আমি নিরাপদে ছাদে রোদ খাইয়ে শিশিতে ভরে ফেলবো, তোরা ফেরার আগেই।'

ছোটদাদুর কথা কাউকে বলতে বটুকদা মানা করেছিল। এমন কি ঐ পৈতৃক বাড়িতেই যারা বাস করেন, তাঁরাও কেউ নাকি ওঁর নাম মুখে আনেন না। বটুকদা সঠিক না জানলেও, উনি অনেক টাকাকড়ি নিয়ে উধাও হয়েছিলেন বলে সন্দেহ করে। ওঁর নামে নাকি ২০ বছর ধরে হুলিয়া চারিয়ে আছে।

এ—সব কথার বেশির ভাগ বটুকদার বড় নানির কাছে পরে শোনা। এতদিন তিনি ভয়ে কাউকে কিছু বলেন নি, এ বছর বর্ষার আগে থানায় আগুন লেগে, কাগজপত্র সব ছাই হয়ে গেছে, অনেক কষ্টে লোক-জনরা বেঁচেছে। ও.সি দুঃখ করে বলেছিলেন লোকগুলো গিয়ে কাগজপত্র থাকলে খুব একটা ক্ষতি হত না, বরং কতকগুলো বেকার লোক চাকরি পেত, আর দেশের অনেক মঙ্গল হতো ইত্যাদি। এতে গত ৬০ বছরের সব নথিপত্র

প্রমাণাদি পুড়ে ছাই! যতসব দুষ্কৃতকারী প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস পাবে! সেইদিনই বড় নানি বটুকদাকে চিঠি দিয়ে ছিলেন।

এসব কথার সূত্রপাত হয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গদীওলা সীটে বসে। ভোরে হাওড়া ছাড়া, বেলা সাড়ে তিনটেয় নিউ জলপাইগুড়ি; সেখান থেকে বাসে সন্ধ্যায় ঘুম; ঘুমে অবতরণ; তারপর উত্তর দিকে খানিকটা হাঁটা পথ। সেই পথটাই ঘুরে নিচে নেমেছে। দুপাক যেতেই ডান দিকে কাঠের ফটক। তাতে লেখা 'আইরি'। বটুক বলল, তার মনে ঈগল পাখির বাসা। ঈগল পাখি খুব উঁচুতে বাসা বাঁধে, সেখান থেকে দূর—দূরান্ত দেখা যায়। এ-ও তাই। বড় নানিকে ছোটদাদু নাকি বলেছিলেন, দোতলায় ওঁর ঘরের উত্তরে মস্ত জানালায় যে দূরবীক্ষণ বসিয়েছেন, তাতে করে শুধু দূরান্তর কেন, কালান্তর—ও দেখা যায়। বড় নানিকে নাকি তারা দূরবীক্ষণ ফেকাস্ করবার কায়দাও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। বড় নানি নিজে বটুকদাকে বলেছেন।

ততক্ষণে ওরা চমৎকার একটা সাঁকোর মতো পার হয়ে, বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। এটা আসলে বাড়ির তিনতলা, তা একতলা মনে হলে কি হবে। সামনে লতানে গোলাপ দেওয়া বারান্দা, তারপর বসবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, অতিথিদের ঘর। দোতলায় নামলে বড় নানিদের এলাকা। তাছাড়া ছোটদাদুর বন্ধ ঘর, যার জানলার দূরবীণ এবং যার চাবি বড় নানির কাছে। তিনি নাকি রোজ ঘর দোর ঝাড়পোঁছ করেন। বইতে বইতে ঠাসা পড়ার ঘরটা। পর দিন সকালে বড় নানি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছিলেন! বিধঘুটে সব যন্ত্রপাতি। ঐ ঘরেই বড় নানির বাবুর্চি শোয়, যাতে দুষ্টু লোকেরা কিছু নষ্ট না করে। সব নানির নামে লেখা। অদ্ভুত মানুষ বুড়ো দাদু আর বড় নানি। একজনার বয়স ৭৪ একজনের ৭০। দেখে মনে হয় ৩৫/৩০। সে কথা বলতে বড় নানি হেসে বলেছিলেন, 'সে আর বলিস্নে বাছা। নামুর যত সব কাণ্ড। ছাঁচি পানে কি জানি ওষুধ পুরে দিল দুজনকে খাইয়ে। তারপর থেকে দিনে দিনে স্বাস্থ্যের উন্নতি! দ্যাখ্ না, দিনে দশবার এক-তলার সবজি বাগান আর চারতলার ফুলবাগান করি।'

বটুকদা ওদের নানির কাছেই তুলেছিল। একতলায় যাঁরা থাকেন, তাঁরা লোক দেখলেই চটে যান। এমন কি বটুকদার বাবার হাফ শেয়ার, তবু ওকে দেখলেও খেঁকিয়ে ওঠেন। তাই ওরও খাওয়া—দাওয়া বড় নানির কাছে। তাতে কোনও অসুবিধা ছিল না। ওঁদের কাঞ্ছা বেজায় ভালো রাঁধে। তারও নাকি

সত্তর বছর বয়েস। দেখে মনে হয় কুড়ি! কে জানে, যাবার আগে তাকেও হয়তো ওষুধ করে দিয়ে গেছে, পাছে কালের গতিতে হাতছাড়া হয়ে যায়! ও—রকম রাঁধুনী পাবে কোথায়?

ফ্রাইড—রাইস্ আর মাংসের বড়া খেতে খেতে বললও সে কথা ন্যাকা। ছোটদাদুর বুদ্ধির প্রশংসাও করল। বড় নানি মহাখুশি। বললেন, 'বেজায় বুদ্ধি ছিল রে! পড়াশুনোয় বড্ড ভালো। তবে খালি পালাই পালাই মন। অদ্ভুত সব যন্ত্র তৈরি করত। অদ্ভুত কথা বলত। যদি বলতাম, 'তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত, নানু , তবেই এক ঠাঁই হয়ে থাকবে।' দাদু হাসত, 'শরীরটে বাঁধলে ও চিন্তাগুলোকে বাঁধতে পারবে কি?'

আমাকে একটু একটু করে বিজ্ঞান পড়াত বাংলা করে—নিজের নোট—বই দেখে দেখে। বারবার বলত, তাই মনে দাগ কেটে যেত। আর একদিন বলেছিল, 'বুঝলে বৌঠান, এই যেমন কথায় বলে দূর—দিগন্তের ওপারে, বহুদূরে, ও-সব কিছু নয়। আমরা ছোট মাপের, তাই দিগন্তটাকেই অনেক দূরে মনে হয়। জান, সব ব্যবস্থার মধ্যিখানে একটা করে শক্তি থাকে। তা সে সূর্যই বল আর যা-ই বল। তার চারিদিকে নির্দিষ্ট নিয়মে কয়েকটা শক্তি বা বস্তু-পিণ্ড ঘোরে। এই তো নিয়ম। এক কণা ধূলোর মধ্যেও, ঐ রকম কত লক্ষ সূর্যমণ্ডলের চারদিকে গ্রহের মতো সব ঘোরে। তাদের মধ্যে যদি খুদে খুদে প্রাণি থাকে, তাদের কাছে ঐ ধূলো কণাটারই অনন্ত বিস্তার। আবার বড়দের বড় সময়, ছোটদের ছোট্ট সময়। আমাদের একবছর হয়তো বিশাল মহাকাশের একদিন, আর আমাদের এক মিনিট হয়তো পরমাণু জগতের একবছর!'

বড় নানির জ্ঞান দেখে এরা সবাই থ'। বোকা বলল, 'আপনিও তাহলে খুব জ্ঞানী! আমার তো সমস্ত জানা ছিল না।' বড় নানি হাসলেন, 'না রে না। দুবার ম্যাট্রিক ফেল। নানু পাখি—পড়া করিয়ে ওসব শিখিয়েছে। একটা খাতায় লিখেও দিয়েছে। দেখাব তোদের। যদি খুঁজে পাই।'

বুড়ো দাদু মন দিয়ে সব শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, 'তোমরা ভালো করে খাওয়া—দাওয়া কর। বড়-বৌয়ের কথায় বেশি গুরুত্ব দিও না। নানু আমার মায়ের পেটের ভাই হতে পারে কিন্তু হওয়াই—জাহাজ তৈরির কোম্পানি খুলে, হাওয়াই—জাহাজটি পরখ করে যে বেমালুম নিখোঁজ হয়েছে, এটা তো অস্বীকার করতে পারে না। কোম্পানির পার্টনার তো নালিশ করবেই, হুলিয়াও বেরুবে। তোমার কুড়ি হাজার টাকার গয়না নেয়নি বলতে চাও?'

বড় নানির মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল, 'নেয়নি মোটেও আমিই দিয়েছি। নেওয়া আর দেওয়ার মধ্যেও কোনও তফাৎ নেই বলতে চাও, তার বদলে আমাকে ওর ঘোরানো দূরবীণটা দিয়ে গেছে। কোম্পানির হাওয়াই—জাহাজ না নিলে, অন্য হাওয়াই—জাহাজ কোথায় পাচ্ছিল শুনি? মহাকাশ না গেলে সময়ের উৎপাতটা পরখ করবে কি করে? ঐ জন্যই তো নিজের বুদ্ধিতে হাওয়াই—জাহাজ তৈরি করা। ওটা কী ঘর সাজাবার জিনিস? তাছাড়া ওর যাবতীয় সম্পত্তি আমাকে লিখে দিয়েছে নেয়নি কিছুই।

বুড়ো দাদু বললেন, 'আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা। সে কবে বিদেশি জেলে গেছে, কি মহাসাগর ডুবেছে, কি ভিন্ গ্রহের বাসিন্দা হয়েছে! মোট কথা আমরা আর তার দেখা পাচ্ছি না।' এই বলে রেগে-মেগে তিনি উঠে চলে গেলেন।

বড় নানি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তা বললে তো আর হবে না । নেই বললেই তো আর কেউ নেই হয়ে যায় না। তাছাড়া আমি দূরবীণটে দিনে তাকে কতবার যাওয়া—আসা করতে দেখেছি। মুখে কালো মুখোশ পরা, হলদে—কালো ডোরা পোষাক, পাছে হুলিয়ার লোকেরা চিনতে পারে। আমাকে দেখে মনে হয় হাসে, রুমাল নাড়ে, হ্যাঁঃ!' বলে গজগজ করতে করতে বড় নানিও শুতে গেলেন। মুখোস পরে কি হাসা যায়?

বটুকদাও দুটো একটা হাই তুলে, শেষ পর্যন্ত বলল, 'তবে বড় নানির কথায় সত্যি বেশি কান দিসনে। সময়ের উৎপাত আবার কি? আমার ছোটদাদুটি যাবার আগে যত রাজ্যের রাবিশ দিয় ওঁর মাথাটি ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। ঐ কাঞ্ছাটিকেও উনিই বহাল করে গিয়েছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল পেয়ারের চাকর। আর বড় নানি নিষ্কম্মাটিকে ধরে এত ভালো রাঁধতে শিখিয়েছেন যে এ—বাড়িতে যে-ই একবার খেয়ে সদসৎ উপায়ে ওকে ভাগিয়ে নিতে চায়। তা ও গেলে তো নেবে। বলে, নানুবাবু ফিরে এসে কি বলবে! যাই বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

বটুকদা নিচে নেমে গেল, ন্যাকা বোকা গরম গেঞ্জি পাজামা পরে লেপের তলায় ঢুকল। কাঞ্ছা এসে পায়ের কাছে গরম ফতুয়া পরানো দুটো হট—ওয়াটার বটল গুঁজে দিয়ে, নমস্কার করে চলে গেল। ওর মুখে এতক্ষণ কোনও কথা-টথা শোনা যায়নি। এরা সবাই একরকম দেখতে হয়। আলাদা করে কি করে চেনা যায়, কে জানে। এই লোকটাকেই যে ছোটদাদু বহাল করেছিলেন, তাই বা কে বলবে?

ওদের খুব ভালো ঘুম হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এত উঁচুতে অবস্থান বলেই

হ’ক, কিম্বা নতুন জায়গা, কিম্বা ভুরি-ভোজন, যে কোন কারণেই হ’ক বারে বারে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। অর্থাৎ বোকার ভালো ঘুম হচ্ছিল না। ন্যাকাকে একটা পেরেকে পাজামার দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে, কানের কাছে সিটি দিলে ও ঘুম ভাঙে না। অথচ এত আরামের বিছানায় ওরা জন্মে শোয়নি। আসলে একটু ভয় ভয় করছিল। ঠিক নিচের ঘরে মহাকাশ দেখার দূরবীন। তাতে করে বড় নানি অনেকবার ছোটদাদুকে যাতায়াত করতে দেখেছেন। এমন কি মুখে কালো মুখোশ পরে সে রুমাল পর্যন্ত নেড়েছে। এত কাছে আনাগোনা করে কিনা। কে জানে ঐ জানালা দিয়ে নিচের ঘরেও আনাগোনা করে কিনা! এত ভালো রাঁধে কাঞ্ছা, তাকে নিয়ে যেতে চাওয়াও বিচিত্র নয়। এইসব ভাবতে আবার কখন বোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, সে রাতে আর কোন তদন্ত করা হল না। তবু আধঘুমের মধ্যে বারে বারে মনে হচ্ছিল, কানে যেন কেমন সব অপার্থিব শব্দ আসছে, বিপ—বিপ্! হু—উশ! এই দরনের। মনে মনেও হতে পারে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল যখন পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে মুখে পড়েছে। খুব কড়া রোদ নয়, তবু বড় মিষ্টি । ন্যাকা আগেই উঠে গেছে। পাশের ঘর থেকে তার গলা শোনা যাচ্ছিল। সেটা হল গিয়ে খাবার ঘর। মধ্যিখানের দরজা খেলা। নাকে একটা গরম গরম ভাজা ভাজা গন্ধ আসতে, এক লাফে বিছানা থেকে উঠে, কাপড় চোপড় পরে, হাত—মুখ ধুয়ে, খাবার ঘরে হাজির হতে বোকার দশ মিনিটও লাগল না। আঃ বাঁচা গেল। সবটাই তাহলে স্বপ্ন। ঐ তো কাঞ্ছা কালো লাল চাক্‌ড়া-বাকড়া গলা-বন্ধ সোয়েটার পরে চীজ আর ডিম দিয়ে বড় বড় পাঁউরুটির স্লাইস্ ভেজে দিচ্ছে। বাবা, মিছিমিছি মনে অত অশান্তি হয়েছিল।

বড় নানি ওদের নিচের তলায় ছোটদাদুর ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। অতবড় দূরবীন ওরা আগে কখনও দেখেনি। বড় নানি কাঞ্ছাকে বললেন, ‘ওরে , সেই কলটা টিপে দে। এই সময়েই তো কতবার নানুকে যেতে দেখেছি।’

কল টেপা হল। তার আগে দূরবীণ ফোকাস হল। তোমরা বিশ্বাস না করতে পার, কিন্তু দূরে হিমালয়ের মাথার একটু নিচে কালো কালো কি সব নড়ছে—চড়ছে দেখা গেল। ন্যাকা-বোকা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে আর কি! ইয়েতি চরে বেড়াচ্ছে! জাপানী পর্বতারোহীরা প্রায় পৌঁছে গেল বলে! নিদেন্ দেবতারা বেড়াতে বেরিয়েছেন! কাঞ্ছা বলল, ‘মক্ষি আছে’, বলে উড়িয়ে দিল!

কেন জানি ওদের একটু রাগ—রাগ মতো মনে হল। বটুকদা বড় নানিকে

বলল, ' কে জানে তুমি যে হাওয়াই—জাহাজ চেপে ছোটদাদুকে যাওয়া—আসা করতে দেখ, সেটাও হয়তো আর কিছু। এত কাছে এলে কি আর আমাদের ছাদে নামতেন না। কে-ই বা টের পেত? তুমিই তো বলেছ, হাওয়াই—জাহাজটা গুটিয়ে ভাঁজ করে ওভারকোটের পকেট পোরা যায়। এতটুকু জিনিস! দেখিয়ে ছিলেন ছোটদাদু তোমাকে।'

বড় নানির বোধহয় কান্না পাচ্ছিল, 'সেজন্য নয় রে! নামলেই হুলিয়াতে ধরবে যে। কোম্পানির জিনিস নিয়ে হাওয়া হাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি। এখন অবশ্যি আর কোনও বাধা নেই, সব প্রমাণ পুড়ে ছাই। কোম্পানির ফাইল সমস্ত কয়লা! তাই এবার তাকে ধরে আনতে কোনও অসুবিধা হবে না। বেচারা! শেষবয়সটা সে একটু আরাম করুক। আমাদের সব কিছু তো বটুকই পাবে। সে কি তোদের কিছু দেবে না?'

ভারি লজ্জা পেল ন্যাকা-বোকা। ওরা এসেছে অ্যাডভেঞ্চার করতে, টাকাকড়ি ওরা চায় না। শুনে বড় নানি খুব খুশি হলেন, 'খুব ভালো। তবে তো কারো কিছু বলার নেই।'

বড় নানি চলে গেলে, পরেও অনেকক্ষণ ধরে ওরা তিনজন ঘরের নানা যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বানাবেন হাওয়াই—জাহাজ, তাঁর এত ওষুধপত্র কিসের? বটুকদা বলল, 'হাওয়াই—জাহাজ' মাথায় ঢোকার আগে, ছোটদাদু যে বুড়ো লামার কাছ থেকে অনেক ওষুধ—পত্র শিখেছিলেন। পর্বতশিখরে বরফের নিচে একরকম মিষ্টি শেকড় পাওয়া যায়, সেটা খেলে আর কোনও পানাহারের দরকার হয় না। এমন কি বেশি খেলে নেশা হয়। তখন যা নেই তা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।'

ন্যাকা চটে গেল, 'কি যা তা বল বটুকদা। এ-সব কে বলেছে তোমাকে?'

বটুকদা বলল, ' কেন ছোটদাদুর কাছে শিখে বড় নানি তাঁর নোটবইতে লিখে রেখেছেন । ঐ খেয়েই তো ওঁদের বয়স বাড়ে না।'

ন্যাকা বলল, 'খাতাটা একবার দেখতে পেলে হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনার কাজটা সহজ হ'ত।' দুঃখের বিষয় এ কথা শুনে বটুক যখন নোটবই চাইল, আঁতিপাতি খুঁজেও বড় নানি সেটি পেলেন না। বললেন, 'কি জানি কোথায় গেল? অনেক বছর দেখিনি। তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই, আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'সম্ভাব্য কোনও যাবার জায়গার কথা বলেননি ছোটদাদু?'



'কী জানি বাছা, বলেছিল হয় তো, লিখেও দিয়েছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটু যা—তাও বলত কিনা। আজগুবি সব কথা! নাকি জায়গা খুব মস্ত করে দিলে, দিনক্ষণও মস্ত হয়ে যায়, আবার জায়গা খুব ছোট্ট করে দিলে সময়ও ছোট্ট হয়ে যায়।'

বটুকদা বলল 'ঐ তো বেশ বুঝেছ। একটা বাড়লে, অন্যটাও বাড়বেই তো। সে তো জানা কথা। তবে আমার ঐ এককণা ধূলোর মধ্যেও ক্ষুদ্রা-তিক্ষুদ্র সৌরমণ্ডলের মতো জিনিস আছে, আর মধ্যে তার চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ খুদে প্রাণীও সম্ভবত আছে। এসব গাঁজাখুরি কথা আমার বিশ্বাসের বাইরে।'

বড় নানি চটে গেলেন, 'তা বললে আর আমি কী করতে পারি বল। তবে আমি সব বিশ্বাস করি। ঐ খুদে প্রাণিদের এক যুগ হল আমাদের হয়তো এক সপ্তাহ। এ কথাটা আমার খুব ভালো করে মনে আছে। যাই, দুপুরে নোনা ইলিশের পাতুরি করব।'

বটুকদা বলল, 'তুমি নাকি কাঞ্জা করবে?'

সেদিন যেজন্যই হ'ক, সকলেরই মনে ভারি একটা অশান্তি দেখা দিল। বটুকদা বলল, ' কোনও বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে এভাবে জানান দেয়। ১৮৯৭ সালের বড় ভূমিকম্পের আগের দিন নাকি কেউ ঘুমোয়নি। ঐ ভূমিকম্পে বাড়িঘরসুদ্ধু আধখানা পাহাড় নিচের চা—বাগানে নেমে গেছিল। কে জানে

বাইবেলের বড় বন্যার আগে নোহার মনেও এমন হয়েছিল কিনা?

বোকা বলল, 'দুৎ সে তো নৌকা বানাতে ব্যস্ত ছিল।'

বটুকদা লাফিয়ে উঠল, 'ঠিক কথা। কাজের মতো আছে কি? আজ একবার গুম্ফায় চল্‌। ছোটদাদুর সেই বড় লামা ওখানে থাকেন। ওঁর কাছেই উনি ওষুধপত্র শিখিয়েছিলেন। কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।'

গুম্ফাটার অবস্থান পাহাড়ের খাঁজে। ঝড়—ঝাপটা থেকে আশ্রয় পায়, অথচ তার লাল গম্বুজ আর সোনালি চূড়ো ওপরে উঁচু হয়ে, অনেক দূর থেকে হতাশ পথিকদের পথ দেখায়। ওঁদের কাছে স্ফটিকের গোলক আছে, কাঞ্ছা বলেছে তাতে গোটা পৃথিবীর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছায়া পড়ে।

ন্যাকার খুব বিরক্ত লেগেছিল। 'এরা একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে আবার অন্যদিকে যত রাজ্যের অলৌকিক তত্ত্বে আস্থা রাখে।'

বোকা বলল, 'না চল, যাওয়া যাক। একটা সুন্দর জায়গা দেখাও হবে, একটু হাঁটাও হবে, আর আজ যাকে অলৌকিক বলা হচ্ছে, কালই হয়তো শুনবি তারও একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। আসলে সব সম্ভাব্য জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়।'

হাঁটা মানে হাঁটা! অর্ধ কিলোমিটার উৎরাই। মনে হয় হাঁটুতে খিল ধরেছে। তারপর ১/৪ কিলোমিটার স্রেফ সিঁড়ি ভেঙে ওঠা। সে আর কহতব্য নয়। মোট কথা, ওপরে গুম্ফার চত্বরে পৌঁছে তিনজনে চিৎপাত! একটু খানি মুচ্ছোও গিয়ে থাকতে পারে, কারণ কাঞ্ছার ডাকে চমক ভাঙল। ইকি! এ আবার কোত্থেকে এল! সে বলল, 'না এলে ঢোকবে কেইসে? যো-সো এলে ভাগায়ে দে-তা। বড় লামা আমার বাবার বাবার দাদু আছেন।' 'এত তাড়াতাড়ি এলি কী করে?' বলে কিনা, 'দড়ির সাঁকো তিয়ার আছে।'

তাই শুনে বটুকদা চটে কাঁই। 'লক্ষ্মীছাড়া, সাঁকো তিয়ার আছে তো আাগে বলিসনি কেন? বলল কিনা, 'জলদি পৌঁছলে অসুবিধা আছে। তাছাড়া শির চক্কর দিয়ে পড়িয়ে যাবেন!'

ভীষণ বকতে যাচ্ছিল বটুকদা, কাঞ্ছা একগাল হেসে বলল পরিষ্কার বাংলায়, 'তেনাকে এনিয়ে রেখেছে।' সে আবার কি? 'কাকে এনিয়েছিস্‌?' 'বাবুরা যাকে ঢুঁড়ছেন ছোটসায়েবকে।' ওরা হয়তো আরেকবার মুচ্ছো হয়ে যেত। ঠিক সেই সময় অবিকল বড়দাদুর মতো দেখতে আরো কম বয়েসের কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'কাগজপত্র সব ঠিক পুড়ে গেছে তো? শেষটা দর্শন দিয়ে

ফ্যাসাদে পড়ব না তো রে? তোদের সঙ্গেই ফিরব ভেবেছিলাম। নিজের ঘরটিতে ছাড়া বইটা লিখতে পারছি না। নাম দেব 'ভুলের নির্ভুলতা'। ভালো নাম না?

ওরা তিনজন এক বাক্যে তাঁর পায়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বলল, 'কি করে খবর পেলে?' 'কেন, কাঞ্ছা যে রোজ রাতে আমার প্রাইভেট বেতারে আমাকে সব খবর দেয়। একটু বিপ্—বিপ্—চগ্—চগ্ করে। হাজার হ'ক কুড়ি বছর আগে ঘরে তৈরি তো। তাহলে ভালো করেই পুড়িয়েছে বলছিস্? বাঃ! হাড়ে বাতাস লাগল। কাঞ্ছা, আমার সুটকেসটা ধর। চল্, যেতে যেতে সব বলছি। এরা কারা?' বটুকে বলল, 'আমি তোমার মেজদার নাতি বটুক, এরা হাতিবাগানের ঠাকুমার দুই নাতি, ন্যাকা আর বোকা। বড় নানি ওদের আনিয়েছেন অন্তরীক্ষ থেকে তোমাকে ধরে আনতে। ওরা খুব ভালো বাঁদর ধরে।'

'এ্যাঁ! বলিস কি রে? যাক্ শেষ পর্যন্ত ধরেই দিলি তাহলে!' ন্যাকা বলল, 'পকেটে করে উড়োজাহজটা এনেছেন?' ছোটদাদু প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন, সেটাই তো নষ্টের গোড়া! পার্টনারের হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিশেষ মিক্সচার দিয়ে অমন ভালো জিনিসটা বানালাম, তা যেই না সৌরশক্তির খুদে যন্ত্রটা চালু করেছি, সব গলে কাদা হয়ে গেল! তখন মহাকাশে পাড়ি দেবার মতলব ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি সটাং বড় লামার কাছে চলে এলাম। তাঁর কাছেই ওষুধপত্র শিখেছি। তিনিও এতদিন তাঁর ওষুধ তৈরির কাজে আমাকে নাচছে বাজারে লুকিয়ে রেখেছিলেন, ক'দিন আগে সেখানে গিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ওরে কাঞ্ছা, ঐ দড়ির পুল দিয়ে আমরা কিন্তু পার হতে পারব না বলে রাখলাম।'

সেখানে জ্যাঠাবাবু জিপ আছে।'

এই তো ব্যাপার! বড় নানি তাঁর আদরের নানুকে ফিরে পেয়ে যেমনি খুশি তেমনি অবাক! 'কিন্তু আমি যে তাকে হলদে—কালো ডোরকাটা পোষাক পরে, মুখোশ লাগিয়ে যাওয়া—আসা করতে দেখছি!' ছোটদাদু বললেন, 'না বৌঠান, মৌমাছি দেখেছ। হুল নাড়ছে। আর—আর—'অনুপাতের উৎপাত'? এই কুড়ি বছর ওষুধ তৈরির ফাঁকে ফাঁকে তাই নিয়ে পড়াশুনা করছি। এবার 'অনুপাতের ধারাপাত' নাম দিয়ে দ্বিতীয় বই লিখব।'

বড় নানি বললেন, 'হ্যাঁ, একটা সুখবর আছে, তোমার পার্টনারটি সগ্‌গে

গেছে।'

বড়দাদু সব শুনে বললেন, 'তাই বলে কুড়ি বছর গা ঢাকা দেওয়াটা শানুর ঠিক হয়নি। হ্যাঁরে। তোরা কি একবারো মনে হল না, আমার গুণ্ডি—মিক্সচারটা কে করে দেবে? ছিঃ!' বলে জোরে জোরে নাক টানতে টানতে ঘরে চলে গেলেন।

বড় নানি বললেন, 'তা সত্যি। এত কাছে থেকে কুড়ি বছর একবারও এলি না!' ছোটদাদু বললেন, 'কাছে নয়। প্রায় অগম্য! দড়ি বেঁধে, ঝুড়িতে বসে, ওপর থেকে ওঠানামা করতে হয়। কোথায় আছি টের পেলে যদি গ্রেপ্তার করে!'

বড় নানি চটে গেলেন, 'আহা! ওষুধ খেয়ে ছোট হয়ে একটা ধুলিকণায় ঢুকে থাকতে পারতিস। বাড়িতেই থাকতিস্। তুই—ই তো বলেছিস পারমাণুর ফাঁকে বাতাস লুকিয়ে থাকে। কী এমন কষ্ট হত।'

'তা হতে পারে । তবে যদি...যদি ওখানে খাবার কষ্ট হয়? ঐটি আমি সইতে পারিনে। তাছাড়া বেরুবার ওষুধটে বড়ই শক্ত। ওটি আমার শেখা হয়নি। তাছাড়া তুমি ঝাড়পোঁছ করে ধূলোর কণাটা উড়িয়ে দিতে।'

বটুক বলল, 'আজ আমাদের কিসমিসের পুর দিয়ে কাবাব হয়েছে।'

এ গল্পের এখানেই শেষ। তবে ছোটদাদুর ওষুধের খুদে পরীক্ষাগারটি পুরোদমে চলছে। ন্যাকা— বোকা কোনও রকমে টুয়েলভটা পাস্ করলেই চাকরি পাবে। তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? ছোটদাদু তাঁর স্মৃতিকথাও লিখছেন। দুঃখের বিষয় বড় নানি তার অনেক জায়গা ফেল্ট পেন দিয়ে কেটে দিচ্ছেন! বলছেন নাকি স্রেফ বাজে কথা।



ভুতুড়ে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



আমি যতই বলি ভূত নেই, ওসব স্রেফ গাঁজার কলকে, কেষ্টা ততই চেঁচাতে থাকে।

'যেদিন ঘাড় মটকে দেবে, সেদিন টের পাবি, বুঝলি?'

'আরে যাঃ যাঃ।...একটা চিনেবাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে আমি বললাম—রেখে দে তোর ভূত। আমার কাছে এসেই দেখুক না বাছাধন, আমি নিজেই তার ঘাড় মটকে দেব।'

কেষ্টা চেঁচাতে লাগল—দেখা যাবে—দেখা যাবে। যেদিন আমগাছে এক ঠ্যাং চাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, সেদিন আর চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে হবে না, বুঝলি? এখন ঘুঘু দেখেছিস তখন ফাঁদ দেখবি।

'ওসব নওগাঁ ব্র্যাণ্ড শিকেয় তুলে রাখ।...আমি সংক্ষেপে মন্তব্য করলাম।'

কেষ্টা বললে—তুই পাষণ্ড, তুই নাস্তিক।

আমি বললাম—হতে পারে। তাই বলে তুই অমন ষণ্ডের মতো চ্যাঁচাবি, এর মানে কী?

কেষ্টা রাগে ভোঁ-ভোঁ করতে করতে উঠে যাচ্ছিল, এমন সময় বাঞ্ছা

কোত্থেকে এসে তার হাত চেপে ধরলে। বললে—আহা-হা চটছিস কেন? সবাই তো প্যালা হতভাগার মতো নাস্তিক নয়। আমি নিজে বলছি, স্বচক্ষে ভূত দেখেছি আমি।

'সত্যি?' —কেষ্টার হাসি গাল ছাপিয়ে কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল।

আমি বললাম, 'বাজে।'

'বাজে! তবে শোন। শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর। কিন্তু কেষ্টা, তার আগে কিছু খাওয়াতে হবে মাইরি। বড্ড খিদে পেয়েছে।'

এমনিতে কেষ্টা হাড়-কেপ্পন। কাউকে এক পয়সা খাওয়ানো তো দূরের কথা, সব সময়েই পরস্মৈপদীর তালে আছে। কিন্তু ভূতের মহিমাই আলাদা। সঙ্গে সঙ্গে এক টাকার ফুলকপির সিঙ্গাড়া আর 'জলযোগের' সন্দেশ চলে এল। সেগুলোর অদ্ধেকের ওপর একাই সাবাড় করে, বড় গোছের একটা ঢেঁকুর তুলে বাঞ্ছা বললে—তবে শোন:

বছর তিনেক আগের কথা।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছি।

গ্রামটা হল কালনার কাছাকাছি, একেবারে গঙ্গার ধারে। খাসা জায়গা। যেমন খাওয়া-দাওয়া, তেমনি আরাম। দু'মাসের মধ্যেই আমি মুটিয়ে গেলাম।

বেশ আছি, আরামে দিন কাটছে। এমন সময় এক অঘটন। পাশের বাড়ির হরিশ হালদার এক বর্ষার রাত্রিতে পটল তুলল।

লোকটা যতদিন বেঁচে ছিল, গ্রামসুদ্ধু লোকের হাড়মাস একেবারে ভাজা ভাজা করে রেখেছে। বাজখাঁই গলা, খিটখিটে মেজাজ। বাড়িতে কাক বসলে হার্টফেল করত, বেড়াল, কুকুর পর্যন্ত বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না। বউটা আগেই মরেছিল, ছেলেটা কোথায় জব্বলপুরে না জামালপুরে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। বাড়িতে বুড়ো একা থাকত। তার মস্ত একটা ফলের বাগান ছিল—সেইটাই পাহারা দিত।

এমন বিদিকিচ্ছিরি লোক যে বিদিকিচ্ছি সময়ে মারা যাবে তাতে সন্দেহ কী! সেদিন বেশ মিঠে মিঠে বৃষ্টি নেমেছে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে, পেট ভরে মুগের ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে বিছানা নিয়েছি—এমন সময় ডাক এল মড়া পোড়াতে যেতে হবে।

আমি খপ্‌ করে বাঞ্ছার কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'ওসব পুরনো গল্প। পত্রিকার পাতায় গণ্ডা গণ্ডা ওরকম গল্প বেরিয়ে গেছে।'

বাঞ্ছা ভ্রূকুটি করে বললে, ‘আরে আগে শোন্ না বাপু! পরে যত খুশি বকর বকর করিস্।’

কেষ্টা বললে, ‘ঠিক!....’তারপর এমন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল যে বামুন হলে নির্ঘাত ভস্ম করে ফেলত।

বাঞ্ছা বলে চলল—কী আর করি! বেরুতেই হল। পাশের বাড়িতে একটা লোক মরে পড়ে থাকবে এটা তো কোনও কাজের কথা নয়। যতই খিট্‌খিটে বদ্‌খৎ লোক হোক না কেন মানুষ হিসাবে একটা কর্তব্য আছে তো!

বেরিয়ে দেখি আমরা মাত্র চারজন। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া মেলেনি—কেউ কাঁপা গলায় বলছে জ্বর হয়েছে, কেউ কাতরাতে কাতরাতে জবাব দিয়েছে, কান কটকট করছে। কাজেই আমাদের চারজনকেই কাঁধ দিতে হল। দু'জনের দু'হাতে দুটো লণ্ঠন ঝুলতে ঝুলতে চলল, আর কাঁধে দুলতে দুলতে চলল মড়া।

মুখুজ্যেদের নরেশ আক্ষেপ করে বললে, জ্যান্তো বুড়ো জ্বালিয়ে মেরেছে মরেও একখানা খেল্ দেখিয়ে গেল।

কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় তো নেই। সেই টিপিটিপি বৃষ্টি আর শন্‌শনে হাওয়ায় বর্ষা-পিছল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। চারদিকে কালির মতো অন্ধকার—গাছপালাগুলো সেই অন্ধকারে এক একটা অতিকায় দৈত্য -দানার মতো মাথা নাড়ছে। বিদ্যুতের চমকানিতে চোখে ধাঁধাঁ লাগাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথ ভুল করে পাশের খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছি আমরা। বৃষ্টির ছাটে চট-চট করে ফাটছে লণ্ঠনের চিম্‌নি! পা পিছলে যেতে চাইছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লেগে চোখ জ্বালা করছে! ভোগান্তি আর কাকে বলে?

‘বল হরি, হরি বল’—চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে চললাম চারজনে। কাঁধের ওপর বুড়ো যেন পরম আনন্দে দোল খাচ্ছে। আমার সন্দেহ হল এখন হয়তো মড়ার মুখের কাপড় সরালে দেখা যাবে, আমাদের দুর্গতিতে মিটি-মিটি হাসছে হাড়-জ্বালানো লোকটা। মনে মনে অভিসম্পাত করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

হ্যাঁ—বলতে ভুলে গেছি, শুধু আমরা চারজনেই নই; বুড়োর দুটো বাগ্‌দী প্রজাও ছিল। তারা তো আর বামুনের মড়াকে কাঁধ দিতে পারবে না, তাই তারা কুড়ুল কাঁধে আসছিল পেছনে পেছনে —কাঠ কেটে আনবে।

সে যাই হোক, শ্মশানে তো পৌঁছনো গেল। শ্মশান ঠিক গাঁয়ের কাছে নয়—বেশ খানিকটা দূরে। আশে-পাশে বাড়ি-ঘর কিছু নেই—অনেকটা পর্যন্ত

ন্যাড়া মাঠের ভেতরে এলোমেলো বাবলার বন। সেখানে একটা মাত্র টিনের চালাঘর—অবশ্য চারদিকে তার দেওয়াল ফেয়ালের কোন বালাই নেই—একেবারে ফাঁকা। এইটেই শ্মশান-যাত্রীদের বসবার জায়গা।

ঠিক তারই নিচে একটা বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার জলে। সিঁড়ি, প্রায় খান পনেরো পৈঠে, এখন বর্ষার জলে তিন-চারখানা মাত্র জেগে রয়েছে। ভাঙাচুরো অবস্থা—যেখানে সেখানে বড় বড় ফাটল, ইট বেরিয়ে পড়েছে। আমরা ওই সিঁড়ির ওপরেই মড়াটাকে নামালাম। এমন ভাবে রাখলাম যাতে মড়ার পা দুটো ডুবানো থাকে গঙ্গার জলে। বুড়োর গঙ্গাযাত্রা হবে, তা ছাড়া এ সুবিধেও আছে যে কারুকে আর ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে না।

মড়া নামিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম চালাটার নিচে। বাগ্‌দীরা কাঠের ব্যবস্থা করুক, তারপর চিতা সাজানো যাবে। বসে গল্প জুড়ে দিলাম আমরা।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। হাওয়ায় হাওয়ায় বাবলা-বনের মাতামাতি। এখানে ওখানে শেয়ালের চোখ ঝল্‌মল্‌ করছে সবুজ রঙের হিংস্র আলোর মতো। সে চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখনো বা ভয় ধরে যাচ্ছিল আমাদের—ভূত নয় তো!

লণ্ঠন দুটোর গায়ে কালি পড়েছে, অল্প অল্প আলো গিয়ে পড়েছে ঘাটে নামানো মড়াটার ওপরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে মড়ার দিকে নজর রাখছি আমরা। শেয়ালে টেয়ালে এসে টেনে না নেয় সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ভীতস্বরে নরেশ বললে, মড়াটা একটু নড়ল না?

আমরা বললাম, ধ্যাৎ—তোর চোখের ভুল।

খানিক পরে আবার পটলা বললে, মড়াটা সত্যিই কিন্তু নড়ে উঠেছে।

আমাদের ভেতরে সবচেয়ে সাহসী ছিল কানু। যেমন বুকের ছাতি তেমনি বেপরোয়া। কানু আশ্বাস দিয়ে বললে, ও কিছু না—জলের ঢেউয়ে নড়ে থাকবে।

এবার মিনিট কয়েক কাটতে না কাটতে আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। কোন ভুল নেই—লণ্ঠনের অল্প অল্প আলোতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মড়াটা সত্যিই একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে!

'ও কি! ও কি!'

আমি, নরেশ আর পটলা একসঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলাম।

কানু সোজা দাঁড়িয়ে উঠল। ধমক দিয়ে বললে, দুত্তোর, ভীতুর ডিম সব!

পেছল সিঁড়ি, তাই গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে। দাঁড়া,আমি তুলে নিয়ে আসি।

মড়া তখনো নামছে, হাঁটু পর্যন্ত তার নেমে গেছে গঙ্গায়! কানু গিয়ে বাঁশের মাচাটা ধরে টান দিলে। কিন্তু কী সাংঘাতিক! কানুর টানকে অস্বীকার করেও মড়াটা আরো নিচে নেমে গেল!

গোঁয়ার গোবিন্দ কানু এবার দু'হাতে মড়াটাকে জাপটে ধরলে। কিন্তু আশ্চর্য —কানু রাখতে পারল না ! দু'ধাপ পিছলে সে সুদ্ধু গিয়ে কোমর জলে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহস উবে গেল তার। এবার কানু আকুল হয়ে চিৎকার করে উঠল, ওরে তোরা ছুটে আয়, মড়া আমাকে সুদ্ধু নিয়ে যাচ্ছে!

ততক্ষণে বুকে আমাদের আর রক্ত নেই, তা জল হয়ে গেছে! আমরা চিৎকার করে বললাম, মড়া ছেড়ে দাও—

কানু বললে, পারছি না—

আমরা ছুটে গেলাম—চেপে ধরলাম কানুকে।

তারপরে যা শুরু হল, সে কথা ভাবতে আজও আতঙ্কে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

ওই হাড্ডিসার মড়াটার গায়ে সে কী অমানুষিক শক্তি! একদিকে আমরা চারজন, অন্যদিকে মড়া একা—আমাদের সকলকে অনায়াসে তুচ্ছ করে সে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলল! ঠাণ্ডা জল আমাদের কোমর ছাড়িয়ে পেট পর্যন্ত উঠল, তারপর এসে পৌঁছুল বুক পর্যন্ত। তারপর —তারপর আমরা পরিস্কার বুঝতে পারছি—আর আমাদের আশা নেই —এই মড়া আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে, চলেছে গঙ্গার অতল জলে, সেখানে—

আশ্চর্য একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা! সমস্ত জ্ঞানগম্যি যেন লোপ পেয়ে গেছে আমাদের। একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে, যেন মরিয়া হয়ে মড়ার সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার চালিয়ে চলেছি আমরা। অথচ বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের জয়ের কোনও আশা নেই, অপদেবতার অমানুষিক শক্তির কাছে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক।

আর সব চাইতে ভয়ানক—মড়া ছেড়ে দিয়ে যে উঠে আসব সে ক্ষমতা আমাদের নেই! কানু মড়াকে ছাড়তে পারছে না—আমরা পারছি না কানুকে। যেন কী একটা মন্ত্রবলে সে আমাদের তার শরীরের সঙ্গে আটকে নিয়েছে—যেন হিপ্‌নোটাইজ করে ফেলেছে সকলকে।

বুক জল ক্রমশ গলা জলে পৌঁছেছে, আর দেরি নেই মৃত্যুর। চারিদিকে

গঙ্গার অন্ধকার কালো জলে যেন শুনতে পাচ্ছি শয়তানের হাসির খিল্-খিল্ শব্দ। গঙ্গার অতল জল—সেখান থেকে প্রেতপুরীর অন্ধকার জগৎ! এই মড়াটা তারই দিকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে!

শেষবারের মতো আমরা সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলাম।

ঠিক এমন সময়—কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিল বাগ্‌দীরা। আমাদের চিৎকার শুনে তারা এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ছিলাম চারজন, হলাম ছয়জন। পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল সে অমানুষিক টাগ-অব-ওয়ার!

তারপর—

তারপর আস্তে আস্তে থেমে দাঁড়াল মড়া। আস্তে আস্তে আমরা জয়লাভ করতে লাগলাম। ক্রমশ মড়া আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে পৌঁছতে লাগল। তখনো প্রচণ্ড টান আছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম ঘাটের দিকে। গলা জল থেকে বুকে জলে, তারপর—

ওদিকের টানটা ঝড়াং করে ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা একেবারে ছিটকে এল ওপরে আর আমরা ছয়জন হুড়মুড় করে এ ওর ঘাড়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলাম।

আর ভুস্—স্-স্—

ঠিক তৎক্ষণাৎ ঘাটের ওপর জলের মধ্যে দেখা দিলে—

বাঞ্ছা থামল।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছি এই অতি ভয়ঙ্কর কাহিনি। একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'কী ভেসে উঠল?'

ধীরে সুস্থে বাঞ্ছা বললে, 'আর কী ? প্রায় দেড়মণ।'

'কী দেড়মণ?' —আকুল স্বরে কেষ্টা প্রশ্ন করলে।

'আমাদের কালনার গঙ্গার বিখ্যাত অতিকায় কচ্ছপ। সেই ব্যাটাই—'

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

কেষ্টা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল:

মিথ্যাবাদী—জোচ্চোর!

বাঞ্ছা বললে—হতে পারি। কিন্তু আজ বেড়ে খাইয়েছিস্ কেষ্টা, ভূতের জয় জয়কার হোক তোর। নিরুত্তরের কেষ্টা হন্ হন্ করে নেমে গেল রাস্তায়।

উত্তর সিকিমের ভূত বাংলো

সমরেশ বসু



এবার আমি তোমাদের গোগোলের গল্প শোনাতে পারলাম না। তাই ঠিক করেছি, এ বছরে, আমার নিজে চোখে দেখা একটা ভুতুড়ে ঘটনার কথা তোমাদের শোনাব। ভুতুড়ে ঘটনাটা সত্যি ভূতের কাণ্ডকারখানা কিনা, সেটা তোমরাই বিচার করবে।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে আমি প্রথম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কোথায় কোন্ হোটেলে উঠব, সে-সব আগের থেকেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু সেখানে কারোকেই চিনি নে। আমি একলা মানুষ। গল্প করার কথাবার্তা বলার লোক নেই। একমাত্র হোটেলের মালিক আর তার মেয়ে, বউ ছাড়া। হোটেলের মালিক ছিল একজন বাস্তুহারা তিব্বতী। চীনারা যখন তিব্বত দখল করে নিয়েছিল, তখন দলাই লামার সঙ্গে হাজার হাজার তিব্বতী ভারতবর্ষে চলে আসে, আর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখনও সেই সব তিব্বতীরা আমাদের দেশেই থেকে গিয়েছে।

গ্যাংটক শহরের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হল, প্রায় দু'কিলোমিটার জায়গা অনেকটাই সমতল। শহরের বাজার, দোকান-পাট, হোটেল রেস্টুরেন্ট, সবই

সেই সমতল রাস্তার দু'ধারে। আর এই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, নীল আকাশের গায়ে সব সময়েই দেখতে পেতাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার বেশ বড় একটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙও বদলাতে থাকত। সেই দিকে তাকালে, বাকিটা সবই নিচের পাহাড়ী অঞ্চল, গাছপালায় নিবিড় সবুজ আর নীল দেখাত। আবার অন্য দিকে পাইন দেবদারু নানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পুলিশের ব্যারাক, সরকারি অফিসগুলো দেখা যেত। সমতল পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যেতাম, এককালের রাজা ছগিয়ালের প্রাসাদের দিকে। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে দেখতাম, তিব্বতী লামা ও ভক্তরা গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচারণ করছেন। আর একটি অনির্বাণ প্রদীপ সব সময়েই জ্বলছে। অনির্বাণ প্রদীপ মানে হল যে প্রদীপ একবার জ্বালালে আর কখনও নিভবে না। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে এ অনির্বাণ প্রদীপ খুবই পূণ্যের জিনিস।

দু'দিন বাদেই এক বাঙালি ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী করে জানলেন আমি এখানে এসেছি?'

সাংবাদিক ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমাদের কাছে কোন সংবাদই চাপা থাকে না। কলকাতার এক খবরের কাগজের সাংবাদিক বন্ধু আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন আপনি গ্যাংটক বেড়াতে এসেছেন। খবর পেয়েই হোটেলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানলুম, আপনি এই হোটেলে উঠেছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম।'

আমিও ভদ্রলোককে পেয়ে খুশি হলাম। তিনি ওর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের একটি পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গেও আমার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। সে আমাকে গ্যাংটকের অনেক গল্প শোনাত। সাংবাদিক ভদ্রলোক গ্যাংটকের যা কিছু দেখবার, সবই আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন, মিলিটারি ক্যাপটেন টি. কে.বাসুর সঙ্গে। টি. কে.বাসু অর্থাৎ তাপসকুমার বসু।

গ্যাংটকের মতো জায়গায়, একজন বাঙালি মিলিটারি ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ হওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ক্যাপটেন বাসু একদিনের আলাপেই আমার এমন বন্ধু হয়ে গেলেন, পরের দিনই তিনি আমাকে তাঁদের মিলিটারি মেসে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, 'আপনি হোটেলেই তৈরি হয়ে

বসে থাকবেন। আমি নিজে না আসতে পারলে, গাড়ি পাঠিয়ে দেব। মিলিটারি ড্রাইভার আপনার খোঁজ করে আপনাকে নিয়ে যাবে।'

গ্যাংটকের মতো জায়গায়, এরকম একজন ক্যাপটেনকে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হল। পরের দিন একজন মিলিটারি পোশাক পরা সর্দারজী অর্থাৎ শিখ ড্রাইভার বেলা এগারটায় হোটেলে এলেন। আমি হোটেলের নিচের তলায় রেস্টুরেণ্টে বসেছিলুম। ড্রাইভার সর্দারজী হোটেলের মালিককে আমার নাম বলতেই তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সর্দারজী আমাকে একটি ছোট চিরকুট দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'দাদা ড্রাইভার যশোবন্ত সিং আপনাকে নিয়ে আসবে। আপনি এর সঙ্গে চলে আসবেন। ইতি, তাপস।'

আমি যশোবন্ত সিংয়ের সঙ্গে একটা জীপে চেপে বেরিয়ে পড়লুম। সমতল পাহাড়ী পথ দিয়ে, মিলিটারি মেসে যেতে আমার রীতিমতো ভয় হয়েছিল। মেসটা ছিল একটা পাহাড়ের মাথায়। রাস্তাটা এমন উঁচু আর খাড়া একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে সোজা যমালয়ে যেতে হবে।

যাই হোক, মেসে পৌঁছুলুম। সামনে লন। একটা গাড়ির পক্ষে পুরোপুরি পাক খাবার মতো জায়গাও নেই। মেস রুমটা বেশ বড়। ক্যাপ্টেন টি. কে. বাসু ছাড়াও আরও বেশ কিছু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ছিলেন। ভদ্রলোকেরা সকলেই নানা স্তরের অফিসার। এবং যিনি মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন, তিনি একজন ওড়িয়া। ক্যাপটেন বাসু ছাড়া আর কোন বাঙালি না থকলেও সকলের সঙ্গেই আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

অনেক রকম রান্না হয়েছিল। সবই দেশীয় রান্না। মাংসের রিরিয়ানি, কাবাবের কোনও তুলনা ছিল না। খাওয়া-দাওয়া মিটতেই প্রায় বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল। ক্যাপটেন বাসুই ছিলেন মেসের ইনচার্জ। আর মেসের গায়েই ছিল তাঁর ছোট দুই কুঠরির থাকবার ঘর। সেখানে বিশ্রাম নেবার সময়েই ক্যাপটেন বাসু আমাকে বললেন, 'উত্তর সিকিম হল মিলিটারির হাতে। সেখানে সাধারণ মানুষ, এখান থেকে যেতে পারে না। বিশেষ অনুমতি লাগে। আর উত্তর সিকিমে যারা বাস করে, তারাও কেউ এদিকে আসতে পারে না। এই সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক কাড়াকড়ি খুব বেশি। তবে আপনি যদি উত্তর সিকিমে বেড়াতে যেতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার কোন অনুমতির দরকার হবে না।'

আমি তো শুনে খুব খুশি। তখনই রাজী হয়ে গেলুম।

দু'দিন পরেই সকাল বেলা একটা জোংগা জীপে চেপে আমরা উত্তর সিকিমের পথে রওনা হলুম। জোংগা জীপ এমন গাড়ি, যা খাড়া পাহাড়ী পথে চলতে পারে। ক্যাপটেন বাসু ছাড়া, আমি, আর ডাক্তার মেজর মোহান্তি, এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন। গাড়ির চালক ছিলেন সেই যশোবন্ত সিংহ।

উত্তর সিকিমের পথটা গিয়েছে তিস্তার উৎসের দিকে। অর্থাৎ তিস্তা যেখান থেকে বরফ গলে, পাহাড় থেকে নেমে, শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে সমতলে নেমেছে। আমরা সেই ওপরে উঠছিলুম। আর আস্তে আস্তে পাহাড় পর্বতের দৃশ্যও বদলে যাচ্ছিল। খুব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে, খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের জীপ চলছিল। আর তিস্তাকে একটা সরু নীল ফিতের মতো অনেক নিচে দেখা যাচ্ছিল। গাছপালা কমতে কমতে, আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম বরফের রাজত্বে। চারদিকের পাহাড়ই অধিকাংশ বরফে ঢাকা।

রাত্রে আমরা যেখানে থাকব, সেখানে রান্নার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু দুপুরের খাবার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, একটা বাংলোয় আমরা দুপুরের খাবার খাব। সেখানেই একটু বিশ্রাম করব। বাংলোটা মিলিটারির অধীনেই ছিল। কিন্তু ডাক্তার মেজর মোহান্তির স্ত্রী মিসেস মোহান্তি ভয় পেয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি, ওটা ভূত বাংলো। আমি ওখানে ঢুকব না।'

মিসেস মোহান্তির কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। ক্যাপটেন বাসু বললেন, 'দিনের বেলা সেখানে আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, বাংলোটা মিলিটারি পাহারা দেয়। বাইরের ঘরে অফিসাররা মাঝে মাঝে অফিসের কাজ নিয়েও বসেন। দুটি খুব ভাল শোবার ঘর আর বাথরুম আছে। আমরা আছি, আপনার কোনও ভয় নেই।'

প্রায় বেলা একটার সময় আমরা সেই বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকেই বরফে আবৃত পাহাড়। উত্তরে, আকাশের গায়ে তুষার ঢাকা পর্বত ছাড়া কিচ্ছু নেই। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমন কি একটা পাখির ডাকও শোনা যায় না। বাংলোর গেটেই দেখা গেল, বন্দুক হাতে একজন সিকিমি সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। আমাদের আসার সংবাদ নাকি আগেই দেওয়া হয়েছিল। সিকিমি সৈনিক মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে, বাংলোর দরজার তালা খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম।

বাংলোর বাইরের ঘরটা বেশ বড়। সোফা-সেট ছাড়াও রয়েছে মস্ত বড় একটা টেবিল। অনেকগুলো চেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা জলভরা কাচের



জগ। অনেক প্লেট থাকে থাকে সাজানো। আর ডজন খানেক জলের গেলাস।

আমি বাংলোর ভিতরের অন্যান্য ঘরগুলো দেখে এলুম। সত্যি বেশ সুন্দর সাজানো ঘর। খাটের বিছানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার মোহান্তি নিজেই মিসেস মোহান্তিকে নিয়ে একটি শোবার ঘরে ঢুকলেন। ক্যাপটেন বাসু ড্রাইভারের সাহায্যে গাড়ি থেকে খাবার নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজালেন। ডাক্তার মোহান্তি বাইরের ঘরে এসে বললেন, 'আমার স্ত্রীর ভয় কেটে গেছে। উনি বাথরুমে গেছেন। এখন বেশ খুশি।'

আমার খুব শীত করছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে একটা শোবার ঘরে গিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। এই সময়ে হঠাৎ মিসেস মোহান্তির একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। তিনি ছুটতে ছুটতে বাইরের ঘরে এলেন। দেখলাম, তাঁর চোখ ভয়ে ও আতঙ্কে বিস্ফারিত। মুখে বোধহয় জল দিয়েছিলেন। মুখটা ভেজা। আমরা সবাই তাঁকে একটা সোফায় বসিয়ে দিলুম। তিনি প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না।

তারপরে কোনরকমে যা বললেন, তা হল, বাথরুমের জানলাটা নাকি হঠাৎ যেন বাতাসের ঝাপটায় খুলে যায়; জানলায় কোন গরাদ ছিল না। জানলায় দেখা যায় বিকট দর্শন একটা মুখ। মাথায় লম্বা লম্বা চুল বেণী পাকানো অথচ মুখে ঝুলের মতো গোঁফ দাড়ি। সে হাসছিল না কী করছিল বোঝা যায়নি। কেবল তার মস্ত লাল জিভ আর বোগড়া বোগড়া বড় দাঁত দেখা গিয়েছিল। সে অদ্ভুত শব্দ করে, মিসেস মোহান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তখনই তিনি কোনক্রমে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসেন।

সব শুনে ক্যাপটেন বাসু তৎক্ষণাৎ সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন। ডাক্তার মিসেস মোহান্তির পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। আমি মনে মনে অবাক হচ্ছিলুম। আশেপাশে কোনও মানুষের বসতি নেই। ওরকম অদ্ভুত মূর্তি এই বরফে ঢাকা পাহাড়ে কোথা থেকে এল?

মিসেস মোহান্তি আবার বললেন, 'ক্যাপটেন বাসু আমার সব কথা না শুনেই চলে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে, আমি যখন ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ মূর্তিটার চেহারা বদলে গেল। দেখলাম, একটা মাথায় এলানো চুল পাহাড়ী মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। তার গলায় অনেক রঙের পাথরের মালা। সে তার এমন লম্বা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, ছিটকিনি না খুলতে পারলে সে আমাকে নির্ঘাৎ ধরে ফেলত। তোমরা কি সেই বিকট হাসি শুনতে পাওনি?'

ডাক্তার মোহান্তি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি কিছুই শুনতে পাইনি।'

মিসেস মোহান্তি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বললুম, 'না, আমিও কিছু শুনতে পাইনি।'

প্রায় পনের মিনিট পরে ক্যাপটেন বাসু ফিরে এসে জানালেন, কোথাও কিছু দেখতে পাননি। কাছে পিঠের মধ্যে বাংলোর পিছনে, পাহাড়ের ওপরে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেখানে একটি আলাদা কাঠের বাড়িতে একটি তিব্বতী পরিবার রয়েছে। সেখানে ওরকম কোন মানুষের মূর্তি দেখা যায়নি, তা ছাড়া ক্যাপটেন বাসু সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গিয়েছিলেন, কেউ পালাতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন। তা ছাড়া সিকিমি সৈনিকটি বলল, পিছনের পাহাড়ে তিব্বতী পরিবারটি খুবই ভাল। তারা এই পাহাড়ে খুব কষ্ট করে কিছু ফসল করে, আর তা খেয়েই বুদ্ধের সেবা করে বেঁচে আছে।

যাই হোক, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। খিদেও পেয়েছিল সকলেরই। বাইরের ঘরের বড় টেবিল ঘিরে আমরা সবাই খেতে বসে গেলাম। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে বাইরে, ওপারের পাহাড়ে বরফের ওপর রোদের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছিল। পরোটা, আলুর দম, শুকনো করে রান্না মাংস আর মিষ্টি ছিল দুপুরের খাবার। আর বড় ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি।

ক্যাপটেন বাসুকে বলে আমি ভিতরে একটি শোবার ঘরে গেলুম। জোংগা জীপে অনেকটা পথ এসে, আর পেট ভরে খেয়ে, আমার যেন শীতটা আরও বেশি লাগল। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের দরকার ছিল না। ঘুম আসছিলও না। আমি একটু আরাম করতেই চাইছিলুম। শুয়ে শুয়ে মিসেস মোহান্তির দেখা ঘটনার কথা ভাবছিলুম।

ভাবতে ভাবতে আমার যেন একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে যেন কেউ পায়চারি করছে। তারই তালে তালে ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে। আর আমার নাকে আসছে একটি মিষ্টি সুগন্ধ। আমার তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকালুম। দেখলুম একটি অদ্ভুত দেখতে মেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমের দরজাটা খোলাই রইল।

দরজাটা কি খোলাই ছিল? মনে করতে পারলুম না। হয়তো স্বপ্নই দেখছিলুম তন্দ্রার ঘোরে। কোনরকমে কম্বলের ঢাকা খুলে, খাট থেকে নেমে, বাথরুমের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম। দিয়েই আবার গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এর পরেও আমাদের অনেকটা পথ যেতে রাত্রি হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ী পথে রাত্রে চলাটা নিরাপদ নয়। কোথায় যে রাস্তায় ধস নেমে আছে, কেউ বলতে পারে না। আর আমরা এমন একট সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে চলেছি, যে-কোন সময়েই বিদেশি সৈনিকের গুলি ছুটে আসতে পারে।

আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা আসছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মেঝেয় কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, গলা থেকে হাঁটু অবধি লাল পোশাক পরা একটি লোক ঘরের একটা জানলার কাছ থেকে দরজা অবধি হেঁটে বেড়াচ্ছে। পায়ে মোজা আর জুতো। মাথায় টুপি পরা থাকলেও লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে। আর তার ফরসা মুখে গোঁফ দাড়িও রয়েছে। আশ্চর্য! এ কোথা থেকে এল? আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে আপনি? এ ঘরে এলেন কেমন করে?'

লোকটা আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে

ভিতরে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য ! সত্যিই ভূত বাংলো নাকি?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। পায়ে জুতো গলিয়ে, বাথরুমের দরজা খুললুম। কেউ কোথাও নেই। কেবল বড় জানলার কাচের পাল্লা দুটো খোলা। জানলার বাইরে জংলী ঝোপ ঝাড়। আমি এগিয়ে গিয়ে জানলায় উঁকি দিতে গেলুম। তৎক্ষণাৎ দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা ধরে টানলুম। কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চিৎকার করে ডাকলুম, 'ক্যাপটেন বাসু, দরজাটা খুলে দিন।'

তখনই জানলার কাছে খিলখিল হাসি শুনতে পেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, চুল এলো করা একটা পাহাড়ী মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। মুখটা তার মোটেই খারাপ নয়। গলা থেকে তার বুক অবধি নানা রঙের পাথরের মালায় ঢাকা। তাকে আমার পাগলী ছাড়া আর কিছু মনে হল না। আমি তার দিকে তেড়ে গেলুম। সে ভয় না পেয়ে তার একটা হাত ভিতরে বাড়িয়ে দিল। আমি হাতটা ধরতে গেলুম। অমনি সে হাতটা সরিয়ে নিল। আমি ওর এলো চুল ধরবার জন্য হাত বাড়ালুম। সে পেছিয়ে গেল, আর খিল খিল করে হাসতে লাগল।

আমি এমনই ক্ষেপে গেলুম, বড় জানলাটায় উঠে বাইরে লাফ দিয়ে পড়লুম। মেয়েটি বোধহয় ভাবতে পারেনি, আমি এমন একটা কাণ্ড করতে পারি। সে দৌড় দিল। আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটলুম। কিন্তু জংলী ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে যে কোথায়, দেখতে পেলুম না। অথচ তার হাসি শুনতে পেলুম। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে আমিও জংলী ঝোপে ঢুকে পড়লুম। এ-নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ মানুষদের ব্যাপার। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময়ে আমি বাংলোর সামনে পাহাড়ের খাদের ধারের রাস্তায় এসে পড়লুম। তখন আর হাসি শোন যাচ্ছে না। জংলী ঝোপও নেই।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আর একটু হলে আমি হাজার হাজার ফুট নিচে পড়ে যেতুম। উত্তরের আকাশে তুষারবৃত পর্বতের গায়ে রোদে নানা রঙ খেলছে। আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম সিকিমি সৈনিকটি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে দেখলুম, ডাক্তার মেজর মোহান্তি আর ক্যাপটেন বাসু দুটো ছোট সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। মিসেস

মোহান্তি বড় সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে ক্যাপটেন বাসু চোখ মেললেন। জিজ্ঞেস করলেন এর মধ্যে আবার বাইরে গেলেন কখন?

বললুম, 'ঘর থেকে এসে বলছি।'

আমি যে-ঘরে শুয়েছিলুম, সে ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা দেখলুম। অবাক কাণ্ড! সত্যি বাইরে থেকে বাথরুমের দরজাটার ছিটকিনি বন্ধ। কে বন্ধ করতে পারে?

আমি শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলুম। ক্যাপটেন বাসুকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে গিয়ে সব কথা বললুম। তিনি শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন, 'আমরা কেউ আপনার শোবার ঘরে ঢুকিনি। কোনও মেয়ের হাসিও শুনতে পায়নি।'

আমরা দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলুম।

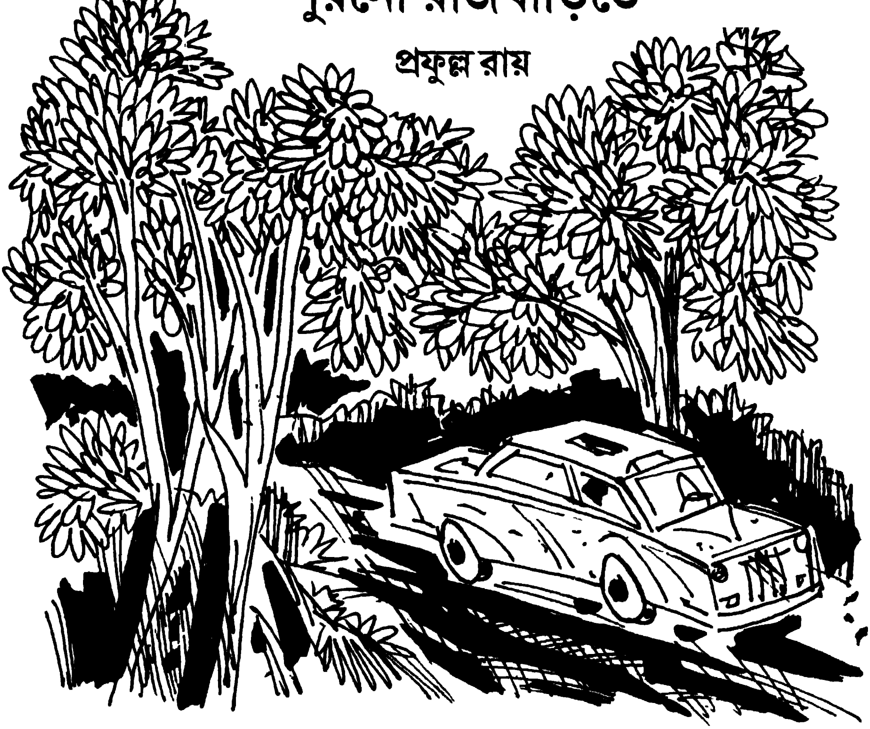
এ ভুতুড়ে ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাই আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা, ওখানে এমন কিছু লোক হয় তো আছে, যারা চায় না, বাংলোয় এসে কেউ থাকুক। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সিকিমি সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে কখনও কিছু দেখেছে কিনা। সে পরিস্কার বলল, 'না, সেরকম কিছু দেখলেই আমি গুলি চালিয়ে দিতুম।'

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে বন্দুক বা রিভলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্যাপ্টেন বাসু আর ডাক্তার মেজর মোহান্তির কাছে রিভলবার ছিল, সেইজন্যই কি ভূতেরা তাঁদের দেখা দেয়নি? কে জানে!....



পুরনো রাজবাড়িতে

প্রফুল্ল রায়



শান্তনুদের বাড়ি থেকে বেরুতেই গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল রাহুলের চোখেমুখে। রোদে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চারদিক।

ক'বছর ধরে কলকাতার আবহাওয়া ভীষণ বদলে যাচ্ছে। গরম পড়তে না পড়তেই এখন লু বইতে থাকে। দিনের তাপ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চড়ে যায়। খবরের কাগজে এ নিয়ে আজকাল প্রায়ই লেখালেখি হচ্ছে। ঝোপঝাড় গাছপালা কেটে, পুকুর আর জলা জায়গা বুজিয়ে যেভাবে বিরাট বিরাট উঁচু বাড়ি উঠছে, তার ফলেই নাকি গরমটা হঠাৎ এত বেড়ে গেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে, মরুভূমির ক্লাইমেটের সঙ্গে কলকাতার আবহাওয়ার তফাত থাকবে না।

সাউথ ক্যালকাটার এই পাড়ার নাম কেয়াতলা। এমনিতে জায়গাটা ভারি শান্ত আর নিরিবিলি। কিন্তু এখন, মে মাসের এই ভরদুপুরে রাস্তায় কোনও লোকজন নেই, চারপাশ একেবারে ফাঁকা। আগুনের মতো গনগনে রোদে কে আর বাইরে থাকবে।

রাহুল তের পেরিয়ে সবে চোদ্দয় পা দিয়েছে। একটা বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে, থাকে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বিপিন পাল রোডে। ওর বাবা একজন পুলিশ অফিসার, মা একটা হায়ার সেকেণ্ডারি গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমিস্ট্রেস। মা-বাবার সে একমাত্র ছেলে, তার কোনও ভাইবোন নেই।

শান্তনু রাহুলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, তারা এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। এই দুপুরবেলা ক'টা ক্যাসেট নেবার জন্য রাহুল কেয়াতলায় এসেছিল।

শান্তনুর বাবা একটা নাম-করা ইংলিশ ডেইলির স্পোর্টস এডিটর। সারা দেশের মানুষ যারা খেলাধূলো ভালবাসে তারা সবাই পরমেশ সান্যালকে চেনে। স্পোর্টস নিয়ে কাগজে তো নিয়মিত লেখেনই, ফুটবল বা ক্রিকেটের বড় বড় টুর্ণামেণ্টের সময় রানিং কমেণ্টারি বা ধারাবিবরণী দিয়ে থাকেন। বলেন চমৎকার, সেজন্য তাঁর ফ্যানও প্রচুর।

পরমেশ মেসোর বিরাট একটা লাইব্রেরি আছে।

স্পোর্টসের অসংখ্য বই, ম্যাগাজিন আর ক্যাসেটে সেটা ঠাসা। ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথালেটিকসের যত বড় বড় ইভেন্ট সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে তার সমস্ত ক্যাসেট এখানে পাওয়া যাবে। আর আছে অগুনতি ফোটোর অ্যালবাম। কে নেই সেখানে? ক্রিকেটে হ্যমণ্ড লারউড থেকে বথাম, ওরেল উইকস সোবার্স থেকে ব্রায়ান লারা, ব্রাডম্যান থেকে বুন, হ্যাডলি, মার্চেন্ট মানকড় থেকে রুদ গুলিট, মার্কো ভ্যান বাস্তেন পর্যন্ত সকলের ছবি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া আছে বুবকা, ক্রিস লুইস, ক্রিস্টিন অটো থেকে ম্যাজিক জনসন, জ্যাকি জয়নার পর্যন্ত সবাই।

রাহুল ফুটবল আর ক্রিকেটের পোকা। কে ক'টা সেঞ্চুরি করেছে, কে ওয়ার্ল্ড কাপে ক'টা গোল করেছে, কে দশ সেকেণ্ডের নিচে একশো মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছে, সব তার মুখস্থ। তাদের স্কুলের ফুটবল আর ক্রিকেট টিমে প্রথম এগারজনের মধ্যে তার জায়গাটা একেবারে পাকা। অবশ্য শান্তনুও থাকে ফার্স্ট ইলেভেনে।

পরমেশ খুবই পছন্দ করেন রাহুলকে। তিনি ঢালাও পারমিশান দিয়ে রেখেছেন, যখন ইচ্ছা যে-কোন ক্যাসেট বা বই সে নিয়ে যেতে পারে।

সাতদিন হল গরমের ছুটি পড়েছে। আর ছুটিটা পড়তে না পড়তেই শান্তনুরা দিল্লি চলে গেছে। সেখানে ওর ছোটকাকার কাছে থাকেন ওর ঠাকুমা। তিনি

হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবরটা আসতেই সবাইকে ছুটতে হয়েছে। কবে ওরা ফিরবে ঠিক নেই। কেয়াতলার বাড়িতে পড়ে আছে কাজের লোকেরা আর শান্তনুর বিধবা পিসি মণিমালা।

গরমের ছুটিটা কীভাবে কাটাবে, দুই বন্ধু আগে থেকে তার নানারকম প্ল্যান করে রেখেছিল, কিন্তু শান্তনুর ঠাকুমার অসুখ হওয়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল।

সময়, বিশেষ করে দুপুরটা এখন আর কাটতে চায় না রাহুলের। তাই সে ঠিক করেছিল, শেষ চারটে ওয়ার্ল্ড কাপের সেরা খেলাগুলো ক্যাসেট দেখে দেখে কাটিয়ে দেবে। সেজন্যই আজ তার কেয়াতলায় আসা।

একটা পলিথিনের প্যাকেট পাঁচখানা ক্যাসেট পুরে নিয়ে সে যখন বেরুচ্ছে, মণিমালা পিসি বললেন, 'এই রোদের মধ্যে যেতে হবে না, এখানেই ভি সি আর চালিয়ে দেখে নে। বিকেলে বাড়ি যাস।'

রাহুল শোনেনি। বলেছে, 'এইটুকু তো রাস্তা। দশমিনিটের মধ্যে চলে যাব।' আসলে মাকে না জানিয়ে সে চলে এসেছিল। বেশি দেরি করলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। মা টের পাবার আগেই সে ফিরে যেতে চায়।

কেয়াতলার এই রাস্তাটা বাঁ দিকে একটা বাঁক ঘুরে সার্দান অ্যাভেনিউতে পড়েছে। সেখান থেকে কোনাকুনি রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গেলে রামকৃষ্ণ মিশন অফ কালচারের বিশাল বাড়ি। ওখান থেকে দেশপ্রিয় পার্কে যাবার প্রচুর বাস পাওয়া যায়। রাহুল বড় বড় পা ফেলে সেদিকে এগিয়ে চলল।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে রাস্তার পিচ গলে গেছে। আশেপাশে লোকজন তো নেই-ই, কাক বা কুকুর-টুকুরও চোখে পড়ছে না। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, গাছপালা, বাড়িঘর, সব যেন ঝলসে যাচ্ছে।

বাঁকের মুখটায় আসতেই চোখে পড়ল ডান দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে একটা সবুজ অ্যাম্বেসেডার দাঁড়িয়ে আছে। ছুরির ফলাব মতো ঝকঝকে রোদে ভাল করে তাকানো যাচ্ছে না, তবু তার মনে হল, গাড়িটার ফ্রন্ট সিটে ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বসে আছে।

অ্যাম্বেসেডর থেকে রাহুল যখন ফুট পাঁচেক দূরে, হঠাৎ রাস্তা ফুঁড়ে প্রায় ছ'ফিট হাইটের দুটো লোক দু'পাশ থেকে তার পথ আটকে দাঁড়াল। দু'জনেরই দারুণ মাসকুলার চেহারা। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট, পায়ে মোটা সোলের জুতো। একজনের মুখ পরিস্কার কামানো, আরেক জনের সরু শৌখিন গোঁফ

রয়েছে। কারো বয়সই সাতাশ-আটাশের বেশি নয়, দেখে মনে হয় ভাল ফ্যামিলির ছেলে।

মাথাটা দ্রুত একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ঘুরিয়ে দু'জনকে দেখে নিল রাহুল। ওদের মতলব যে ভাল নয় সেটা মুহূর্তে টের পেয়ে গেছে সে। এই নির্জন দুপুরে এমন কেউ নেই যে তাকে ডাকতে পারে। অনেকটা দূরে সার্দান অ্যাভেনিউতে অবশ্য হুস হুস করে বাস বা প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে, লোকজনও কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখান থেকে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও ওরা শুনতে পাবে না। কাজেই মাথাটা এখন ঠাণ্ডা রাখতে হবে, এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র সার্দান অ্যাভেনিউর দিকে ছুট লাগাবে। সে তাদের স্কুলের একজন দুর্দান্ত স্প্রিণ্টার, একশো মিটাব দৌড়ে আর দুশো মিটার হার্ডল রেসে ইণ্টার-স্কুল চ্যাম্পিয়ান। সে একবার ছুট লাগালে এই লোক দুটো তাকে কোনভাবেই ধরতে পারবে না।

সরু গোঁফওলা লোকটা বোধহয় থট-রিডার, মুখ দেখে মনের কথা টের পায়। সে হেসে হেসে বলে, 'তুমি যে চ্যাম্পিয়ান স্প্রিণ্টার তা আমরা জানি। দৌড়বার চেষ্টা করো না।'

দেখা যাচ্ছে তার সম্বন্ধে এরা অনেক খবর রাখে। রাহুল জিজ্ঞেস করে, কী চান আপনারা?'

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। গোঁফ নেই লোকটা বলল, 'আমাদের তুমি বন্ধু মনে করতে পার। আমরা যা বলব সেইমতো যদি চল, কোনও ভয় নেই।' বলতে বলতে একটা ছোট রিভলবারের নল রাহুলের ডান কানের ওপর ঠেকায়। সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে গোঁফওলা আরেকটা রিভলবার বার করে তার বাঁ কানের ওপর ছুইয়ে রাখে।

রাহুল বুঝতে পারছিল ওগুলো সত্যিকারের পিস্তল, খেলনা-টেলনা নয়। এমন ভয়ানক অবস্থাতেও সে কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। বেশ মজা করেই বলে, 'এটা কি বন্ধুর মতো কাজ হচ্ছে?'

গোঁফ-নেই বলে, 'উপায় নেই। তোমাকে তো আমরা চিনি, যে কোন সময় ঝামেলায় ফেলে দিতে পার। তাই ও দুটো বার করতে হয়েছে।'

গোঁফওলা বলে, 'রিভলবার দুটোয় সাইলেন্সার লাগানো আছে। গুলি চালালে একটুও শব্দ হবে না। আশা করি, এ সব জানার পর তুমি গোলমাল-টোলমাল করবে না। শুধু শুধু রিস্ক নিয়ে কী লাভ? উই এক্সপেক্ট ইউ উড

কো-অপারেট উইদ আস।'

লোক দুটো বেশ শিক্ষিত। যেভাবে ইংরেজি শব্দগুলো গোঁফওলা উচ্চারণ করল তাতে মনে হয় ইংলিশ মিডিয়ামে সে পড়াশোনা করেছে। রাহুল বলে, 'অলরাইট, কো-অপারেট করব কিন্তু একটা কণ্ডিশান আছে।'

হঠাৎ লোকটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, 'এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয়। কে কখন হুট করে এসে পড়বে। চল রাহুলবাবু—

রাহুলের হাত ধরে সেই সবুজ অ্যাম্বেসেডরটায় তুলে ফেলে ওরা এবং তাকে মাঝখানে বসিয়ে দু'পাশে বসে মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে রাখে। ড্রাইভার তক্ষুনি গাড়িতে স্টার্ট দেয়। মুহূর্তে সেটা রামকৃষ্ণ মিশন আর গোল পার্ক ডাইনে রেখে সোজা গড়িয়াহাটে চলে আসে।

গড়িয়াহাটের মোড়টায় সব সময় জ্যাম হয়ে থাকে। কম করে পনের কুড়ি মিনিট এখানে আটকে থাকতে হয়, তারপর ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল পাওয়া যায়। রাহুল ভেবে রেখেছিল, অ্যাম্বেসেডরটা দাঁড়িয়ে গেলে মুখে তো কিছু বলতে পারবে না, ইশারায় পাশের গাড়ির লোকদের বুঝিয়ে দেবে, তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না।

পুলিশ হাত তুলে সিগন্যাল দিয়ে রেখেছিল। অ্যাম্বেসেডরটা ঝড়ের গতিতে ডাইনে ঘুরে বিজন সেতুর দিকে চলে গেল। এখানে চারপাশে

বাস-ট্রাম, অটোর স্রোত, লোকজনও প্রচুর কিন্তু কাউকে কিছু জানানো সম্ভব হলনা। অসহায়ের মতো মুখ বুজে থাকতে হল।

গাড়িতে ওঠার পর গোঁফওলা আর গোঁফ-নেই টুঁ শব্দও করেনি, শিরদাঁড়া খাড়া করে চনমনে চোখে চারদিকে লক্ষ্য রাখছিল। কসবা পেরুবার পর লোক দুটোর দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল যেন, সিটের পেছন দিকে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল তারা। কেননা, এদিকটা একেবারে ফাঁকা, দূরে গভর্নমেন্টের হাউসিং স্কিমের একই রকম চেহারার অনেক বাড়ি-টাড়ি চোখে পড়ে। দু'ধারের মাঠে গরু আর ছাগল চরছে তবে মানুষ-টানুষ নেই। উল্টোদিক থেকে প্রচণ্ড স্পিড তুলে এককেটা প্রাইভেট কার সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গোঁফ-নেই এবার বলে, 'হ্যাঁ, কণ্ডিশানের কথা কী যেন বলছিলে?'

রাহুল বলে, 'আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিন্তু করতে পারবেন না।'

'আরে না না, তোমার মতো ইন্টেলিজেণ্ট ভাল ছেলের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করা যায়?' গোঁফ-নেই বলতে থাকে, 'আমরা তোমার কোনও ক্ষতি

করব না।'

'থ্যাংকস। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন?'

' সেটা এক্ষুনি বলা যাবে না।'



একটু চুপচাপ।

তারপর রাহুল জিজ্ঞেস করে, 'এই যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, খুনটুন করতে চান?'

দু'জনেই এবার ভীষণ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। গোঁফওলা খুব কাতর গলায় বলে, 'তুমি আমাদের ফ্রেণ্ড। তোমাকে আমরা মার্ডার করব! এমন কথা মুখ থেকে বার করতে পারলে? '

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উইথড্র করছি। তবে কি আমাকে কোথাও আটকে রাখতে চান?'

'আটকে রাখব মানে? তুমি আমাদের একজন লাভেবল গেস্ট। কিছুদিন আমাদের কাছে থাকবে।'

'ক'দিন?'

'দ্যাট ডিপেণ্ডস্—'

বুঝতে না পেরে রাহুল একবার গোঁফওলা, একবার গোঁফ-নেই এর দিকে তাকায়।

গোঁফওলা বলে, 'আসলে ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার বাবার ওপর। তিনি যদি আমাদের কথায় রাজি হন, দু'তিন দিনের ভেতর বাড়ি ফিরে যাবে। তিনি যদি দেরি করেন তোমার ফেরাটাও দেরি হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিল রাহুল। তারপর বলল, 'বাবার কাছে আপনারা কী চান—টাকা?'

গোঁফ-নেই যেন ভীষণ লজ্জা পেয়েছে, এমন ভাব করে জিভ কাটে। বলে, 'ছি ছি, তোমার জন্যে র‍্যানসম চাইব! আমাদের এত খারাপ ভেবো না।'

র‍্যানসম কথাটার মানে যে মুক্তিপণ তা জানে রাহুল। সে বেশ অবাকই হয়। এই ধরনের লোকেরা টাকা আদায়ের জন্যে ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু এরা টাকা চায় না। রাহুল জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে?'

গোঁফওলা বলে, 'তোমাকে সোজাসুজিই বলা যাক। তোমার বাবা তো একজন বিরাট পুলিশ অফিসার—'

এবার আর অবাক হয় না রাহুল। তাদের সম্বন্ধে সব খবর যোগাড় করেই গোঁফওলারা তাকে কিডন্যাপ করেছে। সে আস্তে মাথা নাড়ে।

গোঁফওলা বলে, 'পরশু উনি আমাদের ক'জন বন্ধুকে অ্যারেস্ট করেছেন। ওদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলেই তুমি বাড়ি পৌঁছে যাবে। সেই ক'টা দিন শুধু তোমাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে।'

এবার রাহুলের মনে পড়ে যায়, সত্যিই পরশু বাবা তাঁর ডিপার্টমেন্টের ক'জন জুনিয়র অফিসারকে নিয়ে একদল ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরেছিলেন। কাগজে সেই খবর বেশ বড় করে বেরিয়েছে। গোঁফওলাদের মতলব হল তাকে আটকে রেখে ওদের পুলিশের হাত থেকে বার করে আনা। রাহুল কী বলবে ভেবে পায় না।

গোঁফ-নেই বলে, 'এ ব্যাপারে বন্ধু হিসেবে তোমার কাছে আমরা একটু সাহায্য চাই।'

রাহুল জিজ্ঞেস করে, কী সাহায্য?'

'আমরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে টেলিফোন আছে। ফোন করে বাবাকে বলবে, উনি যেন আমাদের বন্ধুদের ছেড়ে দ্যান। বাবা হয়তো মনে করতে পারেন, তোমার মতো গলা করে কেউ কথা বলছে। তাই একটা চিঠিও লিখে দেবে। সেটা আমরা ওঁর কাছে পৌঁছে দেব।'

এখন আপত্তি করলে বা রাজি না হলে গোঁফওলারা নিশ্চয় খুশি হবে না। ওদের চটিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কোথায় ওরা নিয়ে যাচ্ছে, কখন সেখানে পৌঁছুতে পারবে, জানা নেই। তবু ভাবার মতো খানিকটা সময় নিশ্চয়ই সে পাচ্ছে। পরে ঠিক করে নেবে কী করবে আর কী করবে না। এখন ওদের কথায় সায় দেওয়াই ভাল। রাহুল বলে, 'ঠিক আছে।'

' মেনি থ্যাংকস্!'

গোঁফ-নেই রাহুলকে বলে, 'আমরা আসানগঞ্জ বলে একটা জায়গায় পৌঁছে তোমাকে একটু কষ্ট দেব।'

ভেতরে ভেতরে বেশ ঘাবড়ে যায় রাহুল, অবশ্য লোক দুটোকে তা বুঝতে দেয় না। বলে, 'কিরকম কষ্ট?'

' তোমার চোখ বেঁধে ফেলব। কারণ আসানগঞ্জ থেকে আমরা কোন রাস্তায়

যাব, সেটা তোমাকে জানতে দিতে চাই না।'

'ঠিক আছে।'

এদিকে দমদম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসেছে রাহুল। তার পরের রাস্তাটাস্তা তার একেবারেই অচেনা।

এয়ারপোর্ট পেরুবার পর গাড়ির স্পিড আরো বেড়ে গেছে। এখন রাহুলরা যেখান দিয়ে যাচ্ছে তার দু'ধারে প্রচুর গাছপালা, একটানা ক্ষেত, মাঝে মাঝে দু'—একটা মজা খাল, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। এসবের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম টিন বা টালির চালের বাড়িঘর।

উল্টোদিক থেকে দশ মিনিট পনের মিনিট পর পর ট্রাকের কনভয় গাঁক গাঁক করতে করতে কলকাতার দিকে ছুটে যাচ্ছে। নাম্বারপ্লেট দেখে রাহুল বুঝতে পারল ওগুলো আসছে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক কি তামিলনাড়ু থেকে।

গোঁফ-নেই একসময় বলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যেভাবে কো-অপারেট করছ তাতে আমরা খুব খুশি। এ দুটোর আর দরকার নেই, কি বল?' বলে রিভলবার দেখিয়ে দেয়। সে দুটো এখনও রাহুলের কানের ওপর ঠেকানো রয়েছে।

রাহুল একটু হাসে শুধু, উত্তর দেয় না।

গোঁফ-নেই আর গোঁফওলা তাদের রিভলবার পকেটে পুরে ফেলে। তারা ধরে নিয়েছে রাহুল কোনরকম গোলমাল করবে না।

গোঁফওলা বলল, 'তুমি চাইনিজ খেতে খুব ভালবাস?'

রাহুল জিজ্ঞেস করে 'কী করে জানলেন?'

উত্তর না দিয়ে গোঁফওলা বলে, 'তুমি আর তোমার বন্ধু শান্তনু মাঝে মাঝে তো ল্যান্সডাউন রোডে সাংহাই রেস্তোরাঁয় খেতে যাও। তোমার বাবা ওখান থেকে সপ্তাহে দু'দিন ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন আর অ্যাসপারাগাস সুপ কিনে নিয়ে যান বাড়িতে তাই না?'

দেখা যাচ্ছে এরা তাদের ওপর অনেক দিন লক্ষ্য রেখে বহু খবর যোগাড় করেছে। সে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে বলে, হ্যাঁ।'

' তোমার জন্যে আমরা মিক্সড ফ্রায়েড রাইস্ , ফ্রায়েড প্রণ, বাটার- ভেটকি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি পেস্তা-দেওয়া আইসক্রিম ভালবাস কিন্তু এই গরমে আইসক্রিম গলে যাবে, তাই জলভরা তালশাস সন্দেশ নিয়েছি। ডিনারটা মনে হয় খুব খারাপ হবে না।'

রাহুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'একেবারেই না, আমি ফ্রায়েড প্রণ, বাটার-ভেটকি টেটকি খুব ভালবাসি।'

গোঁফ-নেই জিজ্ঞেস করে, ' ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে কী খাও?'

রাহুল বলে, 'আপনারা এত খবর রাখেন আর এটা জানেন না?'

গোঁফ-নেই একটু থিতিয়ে যায়। তারপর হাসিমুখে বলে, 'সত্যি জানি না। তোমাদের বাড়ির ভেতর তো কখনও যাওয়া হয়নি। যা খেতে চাইবে, সব যোগাড় করে ফেলব।'

'আপনারা যা দেবেন তাই খাব।'

খানিক্ষণ চিন্তা করে গোঁফ-নেই বলে, 'ঠিক আছে, ওটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। বেলা পড়ে আসছিল ক্রমশ। রোদের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে।

গোঁফ-নেই আর গোঁফওলা সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। একজন থামে তো, আরেকজন শুরু করে। ওরা জানতে চাইছিল রাহুলের স্কুলের কথা, স্যাররা কে কেমন মানুষ, কীরকম পড়ান, 'জুরাসিক পার্ক' নামে যে দারুণ একখানা ছবি এসেছে সেটা সে দেখেছে কিনা, না দেখে থাকলে যেন দেখে নেয়—এই সব।

রাহুল অন্যমনস্কর মতো হু-হাঁ করে যাচ্ছিল। আসলে সে ভাবছিল সন্ধের সময় গাড়িটা যখন আসানগঞ্জে পৌঁছুবে গোঁফওয়ালারা তার চোখ বেঁধে দেবে। চোখ বন্ধ থাকলে কিছুই দেখা বা করা যাবে না। যা করার আসানগঞ্জে পৌঁছুবার আগেই তাকে করতে হবে।

কিন্তু কী করা যায় সেটাই মাথায় আসছে না রাহুলের। দু'ধারে দু'জন পাহারাদার গা ঘেঁষে বসে আছে। তা ছাড়া গাড়িটাও ছুটছে প্রচণ্ড স্পিডে। দরজা খুলে লাফিয়ে যে বেরিয়ে যাবে তার উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্কে একটা প্ল্যান এসে যায় রাহুলের। আস্তে আস্তে সিটে হেলান দিয়ে সে চোখ বোজে, যেন গাড়ির ঝাঁকুনিতে আর ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেছে।

গোঁফ-নেই খানিকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'হু—' খুব আস্তে রাহুল বলে।

গোঁফওলা বলে, 'হতেই পারে। একটানা এতক্ষণ মোটর জার্নি, তার ওপর

এত গরম—'

গোঁফ-নেই আদরের ভঙ্গিতে রাহুলের হাতে একটা হাত রেখে বলে, 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে পার।'

রাহুল বলে, 'না, ঠিক আছে। একটু জল—'

গোঁফ-নেই ড্রাইভারকে বলে, 'এই আজিজ, তোর কাছে ওয়াটার বটলটা ছিল না? দ্যাখ তো জল আছে কিনা—'

ড্রাইভারের নামটা জানা হয়ে গেল রাহুলের।

আজিজ বলে, 'কখন ফুরিয়ে গেছে।'

'মুশকিল হল।'

'এক কাজ কর স্বপন, রাস্তায় টিউবওয়েল-টোয়েল চোখে পড়লে ওয়াটার বটলটা ভরে নিস।'

'হ্যাঁ, তাই নিতে হবে।' গোঁফ-নেই-এর নাম স্বপন। সে এবার রাহুলের ডান পাশের গোঁফওলাকে বলে, 'রাস্তার ওধারে নজর রাখিস তো সুবল। টিউবওয়েল ওদিকেও থাকতে পারে।'

গোঁফওলা অর্থাৎ সুবল ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'আচ্ছা—'

স্বপন, সুবল, এবং আজিজ, মনে মনে নাম তিনটে মুখস্থ করে ফেলে রাহুল।

আরো অনেকটা যাবার পর সূর্য যখন ডুবে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকের গাছপালার মাথা শেষ বেলার রোদে লাল হয়ে উঠেছে সেই সময় স্বপন চেঁচিয়ে ওঠে, 'আজিজ, গাড়ি থামা—'

সবুজ অ্যাম্বেসেডর দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে শব্দ করে থেমে যায়। দেখা গেল রাস্তার বাঁ ধারে একটা কুয়োকে ঘিরে ছোটখাট ভিড়। ওদের সবাই নানা বয়েসের মেয়েমানুষ। ওদের সঙ্গে একটা করে মাটি বা পেতলের কলসী। একজন দড়ি টেনে টেনে কুয়ো থেকে জল তুলছে। অন্যেরা অপেক্ষা করছে। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই গ্রাম আছে, ওরা সেখান থেকে জল নিতে এসেছে।

স্বপন বলে, 'রাহুলবাবু, তোমরা একটু ওয়েট কর। আমি কুয়ো থেকে জল নিয়ে আসি।'

রাহুল সাড়া দেয় না। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন ভাব করে কাত হয়ে থাকে।

স্বপন আজিজের ওয়াটার বটলটা হাতে ঝুলিয়ে কুয়োর দিকে চলে যায়।

রাহুল মনে মনে ভেবে নেয় জল নিয়ে স্বপনের ফিরে আসতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগবে না। সময়টা খুবই দামী। যা করার এর মধ্যেই করে ফেলতে হবে।

আস্তে আস্তে ডান দিক ফিরে চোখের পাতা অল্প একটু খুলে রাহুল দেখতে পায়, সুবল জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর আজিজ খুব মন দিয়ে উইণ্ডস্ক্রিনের ওধারে কী যেন দেখছে। দু'জনের কারো তার দিকে লক্ষ্য নেই।

এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। নিঃশব্দে সে ওধারের দরজা দিয়ে নেমে যায়। কুয়োর দিকে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। সেখানে স্বপন রয়েছে। রাহুল সবুজ অ্যাম্বেসেডর আর স্বপনের ওপর চোখ রেখে খুব সাবধানে উল্টো দিকে কয়েক পা গিয়ে ছুটতে শুরু করে।

এদিকটায় বাড়িঘর গ্রাম-ট্রাম কিচ্ছু নেই । জায়গাটাও সমতল নয়, উঁচুনিচু। যতদূর চোখ যায় ঢেউ-খেলানো ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়।

ছুটতে ছুটতে রাহুল ভাবল, সবার আগে স্বপনদের চোখের আড়ালে যাওয়া দরকার। তারপর ঠিক করবে কী করে কলকাতায় ফেরা যায়। তার সঙ্গে চল্লিশ টাকার মতো আছে। বাস বা ট্রেন যা-ই পাওয়া যাক, ঐ টাকায় কলকাতার টিকেট হয়ে যাবে। শুধু আপসোস হচ্ছে শান্তনুদের সেই ক্যাসেটগুলো গাড়িতেই পড়ে রইল। ওগুলো আনলে অতটা ওজন নিয়ে দৌড়তে অসুবিধা হতো।

স্বপনের মাথার ভেতর একটা ক্লোজ সার্কিট টিভি বসানো রয়েছে যেন। হঠাৎ বোধহয় বুঝতে পারে রাহুল গাড়ির ভেতর নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় সে। যা ভেবেছিল তাই, গাড়িতে আজিজ আর সুবল রয়েছে শুধু।

বিদ্যুৎগতিতে স্বপন অ্যাম্বেসেডরটার কাছে চলে আসে। চিৎকার করে বলে, 'ইডিয়টস, ছেলেটা ভাগল আর তোরা এখানে হাঁ করে বসে আছিস। বেরিয়ে আয়, কুইক। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে ভীষণ বিপদ—'

আজিজ আর সুবল গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। এধারে ওধারে তাকিয়ে অনেক দূরে ওরা একটা ছোটখাট টিলার মাথায় রাহুলকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে শিকারি কুকুরের মতো সেদিকে ছুটতে থাকে।

রাহুল দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। সে স্বপনদের দেখতে পেয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে তিন চারশো গজের দূরত্ব আর সে নিজে চ্যাম্পিয়ন স্প্রিণ্টার, তবু ছোটার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

রুক্ষ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে হরিণের মতো যেন উড়ে যাচ্ছে রাহুল। সে

জানে, এ জন্মে তাকে ধরা স্বপনদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটাই ভয়, ওরা যদি পেছন থেকে গুলি-টুলি ছুঁড়ে বসে। অবশ্য অতদূর থেকে ছুটন্ত অবস্থায় টার্গেটে গুলি লাগানো সহজ না।

প্রায় দু' কিলোমিটার দৌড়বার পর খানিকটা দূরে একটা নদী চোখে পড়ল। নদীটা এক সময় বিরাট ছিল, কিন্তু দু'ধারে খাত অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মতো সরু জলের ধারা সেখানে স্রোত আছে কি নেই। নদীটার এপারে ওপারে অসংখ্য বক মৌনীবাবাদের মতো বসে আছে।

রাহুল থমকে দাঁড়িয়ে যায়, তারপর পলকের জন্য ঘুরে তাকাতেই চমকে ওঠে। স্বপনরা তার পিছু ছাড়েনি। মাঝখানের দূরত্বটা সেই তিন চারশো গজের মতোই রয়ে গেছে। তবে আগে তিনজন একসঙ্গে, প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে আসছিল। এখন তারা কৌশলটা পালটে ফেলেছে স্বপন আসছে অনেকটা ঘুরে ডান দিক থেকে, আজিজ বাঁ দিক থেকে আর সুবল সোজাসুজি। তার মানে নদীর দিকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাহুল তরতর করে নেমে যায়। সে খুব ভাল সাঁতার জানে, অ্যাণ্ডারসন ক্লাবে ছোটবেলা থেকে শিখে আসছে। কিন্তু তার দরকার হল না, নদীতে জল মোটে কোমরসমান।

রাহুলকে দৌড়ে আসতে দেখে বকেরা কঁককঁক আওয়াজ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যেতে লাগল।

নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে সিকি কিলোমিটার যেতেই পাতলা জঙ্গল। সেটা পার হলেই মস্ত একটা টিলা, টিলার মাথায় জঙ্গল ঘন হয়ে আছে, তার ভেতর প্রকাণ্ড একটা ভাঙাচোরা বাড়ি, একসময় হয়তো রাজপ্রাসাদ ট্রাসাদ ছিল। টিলায় উঠে আবার পেছন ফেরে রাহুল। স্বপনরা এখনও তাড়া করে আসছে।

এদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গেছে। আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে সবদিকে। রাজবাড়িতে ঢোকা ছাড়া উপায় নেই রাহুলের।

জঙ্গল ঠেলে আরো কিছুটা যাবার পর বিশাল গেট। লোহার পাল্লা কবেই ভেঙে গেছে। পাশের নহবতখানার একই হাল। রাহুলের পায়ের শব্দে শুকনো পাতার উপর দিয়ে সরসর করে গিরগিটি আর নানা ধরনের পোকামাকড় ছুটে যেতে লাগল। কোথায় যেন তিন-চারটে তক্ষক ডেকে উঠল।

রাহুল রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে। আপাতত এখানে তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভাববে কী করে স্বপনদের চোখে ধূলো দিয়ে

কলকাতায় পৌঁছুনো যায়।

গেট পেরুতেই অনেকটা ফাঁকা জায়গা। বোঝা যায় সেখানে একসময় বাগান ছিল, এখন শুধুই আগাছা। তার ভেতর পাথরের তৈরি অনেকগুলো হাত-পা ভাঙা পরী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে । একটা মস্ত ফোয়ারাও দেখা গেল, তবে সেটা আস্ত নেই, পরীগুলোর মতোই তার হাল।

আগাছার ভেতর দিয়ে একটু এগুলেই চওড়া-চওড়া অনেকগুলো শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে একতলার একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে চলে আসে রাহুল। মেঝেতে এক ফুট ধূলোবালি জমে আছে। হলটাকে ঘিরে দশ-বারোটা ঘর, কিন্তু কোনটারই দরজা-জানলা নেই, সব হা হা করছে। না, এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না, স্বপনরা ঠিক ধরে ফেলবে।

হল-এর ডান দিক দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে তর তর করে ওপরে উঠে যায় রাহুল। দোতলাটা ঠিক নিচের তলার মতো। বিরাট হল ঘিরে এখানেও অনেকগুলো ঘর কিন্তু সেগুলোর দরজা-জানলা কবেই লোপাট হয়ে গেছে।

রাহুল এমনিতে খুব সাহসী ছেলে কিন্তু এখন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। কী করবে, কোথায় লুকোবে যখন ঠিক করতে পারছে না সেই সময় চাপা ঘষা ঘষা গলায় কে যেন বলে উঠে, ' কোন ভয় নেই। ডাড় পাশে সিঁড়ি আছে সোজা ছাদে চলে যাও।'

রাহুল চমকে ওঠে, তার সারা গায়ে কাঁটা দেয়। ভয়ে কাঠ হয়ে চারপাশে তাকাতে থাকে সে কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না।

সেই গলাটা আবার শোনা যায়, 'দাঁড়িয়ে থেকো না। ওরা এসে পড়ল বলে—'

সাহস করে এবার রাহুল জিজ্ঞেস করে, 'কাদের কথা বলছেন?'

'যারা তোমাকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, চোখে পড়ল।'

'আপনি কে?'

' তোমার বন্ধু। চল, শিগগির চল--'



এরকম তাড়া দিয়ে দিয়ে রাহুলকে অদৃশ্য কেউ সিঁড়ির দিকে নিয়ে যায়। দেখা না গেলেও ওপরে উঠতে উঠতে সে টের পায় তার পাশাপাশি একজন

আছে। ছাদটা জঞ্জালে বোঝাই। একধারে ভাঙা আলমারি, খাট এবং অন্যান্য বাতিল আসবাব ডাঁই হয়ে আছে। আরেক দিকে লোহার দরজাওলা এক ঘর। ঘরে যে লোহার দরজা লাগানো হয় সেটা এই প্রথম দেখল সে।

রাহুল কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে স্বপনদের গলা ভেসে আসে।

'মনে হচ্ছে দোতলাতেও নেই।'

'ছাদে চল।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ কুইক।'

সুবল একসময় বলে ওঠে, 'এই বাড়িটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। অনেকদিন আগে একবার এসেছিলাম না?'

স্বপন বলে, 'রাইট। নির্মলকে নিয়ে এসেছিলাম। তুই তার মাথায় গুলি করেছিলি—'

'আমি একা নই, তোরা দু'জনেও। আজিজের বুলেট লেগেছিল নির্মলের পেটে, তোরটা ওর বুকে।'

আজিজ বলে., 'এ বাড়িতে আজ আরেকটা মার্ডার হবে।'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে রাহুলের। কানের কাছে সেই ঘষা গলাটা ফের শুনতে পায় সে, 'নার্ভাস হয়ো না, চট করে ভাঙা আলমারি-টালমারিগুলোর পেছনে লুকোও।'

রাহুল আর দাঁড়ায় না, দৌড়ে আসবাবের স্তূপের আড়ালে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে। গরমকালের সন্ধে বলে অন্ধকার এখনও তেমন ঘন হয়নি। তাই সে দেখতে পেল স্বপনরা ওপরে উঠে এসেছে। ইলেভেন-এ সাইড ফুটবল খেলার মাঠের মতো ছাদটা বিশাল। স্বপনরা এ-মাথা থেকে ও-মাথায় তিন-চার বার উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করল। এইটুকু বাঁচোয়া, রাহুলের দিকে ওরা আসেনি।

ওরা যে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে সেটা ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হল।

'ছোকরা গেল কোথায়?'

'কি জানি, ওকে এই তো ছাদে উঠতে দেখলাম। এর ভেতর উবে গেল?'

'চল কার্নিসগুলো একবার দেখি।'

গোটা ছাদের ধার ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে অনেকখানি ঝুঁকে কার্নিস দেখল স্বপনরা, তারপর হতাশ হয়ে ছাদের মাঝখানে চলে এল।

সুবল বলে, 'ছাদে ওঠার একটাই সিঁড়ি, ওপর থেকে লাফ না দিলে আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে নিচে নামার উপায় নেই। তা হলে কোথায় উবে গেল?'

হঠাৎ আজিজ বলে ওঠে, 'আরে ঐ ঘরটা তো দেখা হয়নি। চল,চল। নিশ্চয়ই ওর ভেতর লুকিয়ে আছে।' লোহার দরজাওলা ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় সে।

তারপর তিনজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে সেই ঘরটায় ঢোকে, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজ করে দরজা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। রাহুলের মনে হল কেউ যেন বাইরে থেকে জোর করে পাল্লা আটকে দিয়ে শেকল তুলে দিল।

স্বপনদের চিৎকার ভেসে আসে, ' কে, কে? কে দরজা বন্ধ করল? খোল-খোল—' ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। চেঁচাতে চেঁচাতে পাগলের মতো তারা দরজায় লাথি মেরে চলেছে।

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

দমবন্ধ করে বসে ছিল রাহুল। সে জানত, তার সেই অদৃশ্য বন্ধুর গলা একসময় শুনতে পাবে। শোনা গেলও।

' বেরিয়ে এস।'

রাহুল আড়াল থেকে উঠে আসতেই অশরীরী এবার বলে, ' তোমার নামটা এখনও জানা হয়নি ভাই।'



রাহুল নাম বলে।

অশরীরী বলে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

' কোথায়?'

'এসোই না। তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সময় পাইনি। খানিক আগে আলসের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখলাম তিনটে বদমাশ তোমাকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। ঐ পাজিগুলোর পাল্লায় পড়লে কী করে?'

সব জানিয়ে দেয় রাহুল।

অশরীরী বলে, 'এবার বুঝলাম। জানো, একদিন ওরা আমাকে কিডন্যাপ করে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। তারপর গুলি করে মারে।'

রাহুল চমকে ওঠে। গুলি করার কথা স্বপনদের মুখে আগেই শুনেছে সে। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার নাম কি নির্মল?'

'হ্যাঁ, আমার নাম নির্মল সেন।'

'আপনাকে কিডন্যাপ করে এনে খুন করেছিল কেন?'

নির্মল জানায়, স্বপনদের একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি দেখে ফেলেছিল সে। যাতে পুলিশের কাছে মুখ খুলতে না পারে সে জন্য তাকে পোড়ো রাজবাড়িতে নিয়ে এসে গুলি করে মারা হয়।

নির্মল বলে, 'এতদিন পর ওদের পেয়েছি আর ছাড়ছি না।'

কথায় কথায় ওরা একতলায় নেমে আসে। কিছুক্ষণ আগে স্বপনদের তাড়া খেয়ে নদীর দিক থেকে এ বাড়িতে ঢুকেছিল রাহুল। নির্মল তাকে নদীর উল্টোদিকে রাজবাড়ির বাইরে একটা কাঁচা রাস্তায় নিয়ে এল। বলল, 'এই পথটি ধরে মিনিট কুড়ি হাঁটলে রেলস্টেশন পড়বে। ওখান থেকে কলকাতার ট্রেন পাবে। তোমার কাছে টিকিট কাটার টাকা আছে তো?'

'আছে।'

'সাড়ে আটটার ট্রেনটা ধরলে ভোরে কলকাতায় পৌঁছে যাবে। গিয়েই তোমার বাবাকে স্বপনদের কথা জানাবে। কালই যেন ওদের অ্যারেস্ট করা হয়। যতক্ষণ না পুলিশ আসছে, আমি ওদের আটকে রাখব।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'আমাদের বাড়ি টালিগঞ্জের তের নম্বর রজনী মণ্ডল লেনে। সেখানে তোমাকে একটা খবর দিতে হবে। আমার মা-বাবা আর দাদারা জানেন আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও আমাকে খুঁজে পায়নি। কী করে পাবে? আমি তো খুন হয়ে গেছি। মা-বাবাকে এই কথাটা জানিও।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাহুল বলে, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন কিন্তু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। কোনভাবেই কি একবার দেখা যায় না?' বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়ে আসে।

'না। আমার শরীরের সব কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে। সেগুলো এখনও একসঙ্গে জড়ো করতে পারলে আমার সলিড চেহারাটা দেখতে পেতে। কিন্তু সেটা যখন হচ্ছে না, আমাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে যেও। ওখানে আমার ফোটো আছে।'

জোরে নিশ্বাস ফেলে রাহুল বলে, 'নিশ্চয়ই যাব আপনাদের বাড়িতে।'

নির্মল বলে, 'আর দেরি করো না। সাড়ে আটটার ট্রেনটা কিন্তু ধরতেই

হবে। দেখি ওধারে খুনেগুলো কী করছে!'

রাহুল তবু দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর ডাকে, 'নির্মলদা—'

সাড়া পাওয়া যায় না। আরো দু'-চার বার ডাকাডাকির পর স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করে রাহুল।

পরদিনই স্বপনরা ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন বাবার সঙ্গে রজনী মণ্ডল লেনে গেল রাহুল। নির্মলের খবরটা পাওয়ার পর তার মা-বাবা দাদারা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, তবে রাহুলকে আদরও করলেন খুব।

আসার সময় নির্মলের একটা ফোটো চেয়ে আনল রাহুল। ভারি সুন্দর দেখতে নির্মলকে, আঠার-উনিশের বেশি হবে না। সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি।

ফোটোটা এনলার্জ করে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখে রাহুল। সে ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে নিয়ে মাসে একবার অন্তত সেই পোড়ো রাজবাড়িটায় যাবে। বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়া শরীরের অংশগুলো নির্মল নিশ্চয়ই একদিন না একদিন জড়ো করে ফেলবে। যদি না-ও পারে তার সঙ্গে কথা তো বলে আসতে পারবে।



বটুকদাদার পাখি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



আমাদের বটুকদাদা পাখিদের বলাতে পারতেন।

পাখিরা যে সত্যি মানুষের মতন কথা বলতে পারে তা আমি নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। রূপকথায় শূক-সারী আর ব্যঙ্গমা—ব্যঙ্গমীর গল্প পড়েছি। কিন্তু রূপকথা তো রূপ কথাই। পক্ষিরাজ ঘোড়া, মাছের পেটে মানুষ আর মানুষখেকো দৈত্য যে সত্যি সত্যি কোথাও নেই, তা আমরা ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলুম। সেই রকমই জানতুম যে কথা—বলা পাখির কথা এমনিই কথার কথা।

কিন্তু বটুকদাদা আমাদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

বটুকদাদা অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন উপস্থিত হতেন আমাদের বাড়িতে, সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাথা ভর্তি গল্প আর ঝোলা ভর্তি খুচরো পয়সা। একবার তিনি নিয়ে এলেন একটা পাখি।

খাঁচায় বন্দী করে নয়, পায়ে শিকল বেঁধেও নয়। পাখিটা বসে ছিল বটুকদাদার কাঁধে।

সেটা যে ঠিক কী পাখি তা চেনা গেল না। দেখতে অনেকটা বেশ বড় সড় ঘুঘু পাখির মতন, কিন্তু গায়র রং সবুজ। সেটাকে টিয়া পাখিও বলা যায় না। কারণ টিয়া পাখির মতন লাল ঠোঁট নেই। অথচ সবুজ রঙের ঘুঘু পাখিও তো আমার কেউ কখনো দেখিনি।

বটুকদাদা বললেন ওটা একটা পাহাড়ী পাখি। কী করে যে একা একা এদিকে চলে এসেছে। আমি নৌকা করে আসছিলুম, পাখিটা প্রথমে উড়ে এসে ছই—এর ওপর বসলো। আমি আদর করে ডাকলুম, আয় আয়, কাছে আয়। কয়েকবার ডাকতেই আমার কাঁধের ওপর এসে বসল। আমার চোখ দেখে ঠিক বুঝেছিল। আমি তো পাখিদের ভালবাসি, তাই ওরা আমাকে ভয় পায় না।

বটুকদার সব কথাই তো অদ্ভুত, তাই এটাকে তো আমরা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে ধরে নিলুম। অবশ্য পাখিটা যে শান্তভাবে বটুকদাদার কাঁধে বসে আছে, সেটাওতো ঠিক।

বটুকদাদা বললেন, দু'দিন ধরে নৌকায় আসতে আসতে আমি পাখি—টাকে কথা বলতে শিখিয়েছি। আমিতো পাখিদের ভাষা জানি তাই ওরাও আমার কাছ থেকে চট করে মানুষের ভাষা শিখে নেয়।

তাই শুনে আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, কই, কই, আমরা পাখিটার কথা শুনব! কথা শুনব!

বটুকদাদা হতে তুলে বললেন, শুনবি শুনবি। এক্ষুনি না। এত নতুন লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে। আমি চান খাওয়া করে নি, তারপর তোদের শোনাব।

আমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে ছিল একটা বেশ মস্ত উঠোন। তার তিন দিকেই ছোট ছোট একতলা ঘর। বটুকদাদা এলে তাঁকে দেওয়া হতো উত্তর দিকের কোণের একটি ঘর। সেই ঘরের খুব কাছেই পুকুর ঘাট।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বটুকদাদা বললেন, আমার পাখিটা ইচ্ছে মতন এখানে উড়ে বেড়াবে। তোরা ওকে আদর করে ডেকে কথা বলতে পারিস, কিন্তু ওর গায়ে হাত দিস না। পাখিদের গায়ে হাত দিতে নেই। এর নাম আমি দিয়েছি কেষ্ট।

তারপর বটুকদাদা পাকিটাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার একটু পরেই স্পষ্ট শোনা গেল, কে যেন বলছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

আমার ছোট ভাই বকু উত্তেজিত ভাবে বলল, ঐ যে, পাখিটা কথা বলছে!

আমার ছোড়দি মুন্নির খুব বুদ্ধি আর সব কিছুতেই সন্দেহবাতিক। ছোড়দি ঠোঁট উল্টে বলল, ধ্যাৎ! ওটা আবার পাখির ডাক নাকি?

আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য বটুকদাদা নিজেই ওরকম ডাকছে!

তক্ষুনি পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রান্না ঘরের পাশে, পুকুর ঘাটের কাছে তেঁতুল গাছটার একটা নিচু ডালে গিয়ে বসল।

আমরা দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে বলতে লাগলুম, কেষ্ট, কেষ্ট আমরা তোমায় খুব ভালবাসি, আমাদের একটু কথা শোনাও তো!

পাখিটা যেন অবাক হয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল অনেক দূরে।

আমরা বটুকদাদার ঘরের কাছে গিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে বললুম ও বটুকদাদা, তোমার পাখি উড়ে গেল। কোথায় যেন চলে গেল!

বটুকদাদা তখন ধুতি—পাঞ্জাবী খুলে পাজামা আর আলখাল্লা পরছেন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, চিন্তা করিস না, ও আবার ঠিক আসবে। এখন ওর জল—খাবারের সময় তো!

অনেকখানি রাস্তা নৌকো করে এসেছেন বলে বটুকদাদা ক্লান্ত হয়ে ছিলেন, তাই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল বয়ে গেল, তখনও পাখিটার দেখা নেই। বটুকদাদার কাছে আমাদের গল্প শোনা হচ্ছে না বলে আমরা ছটফট করতে লাগলুম। বাড়ির বড়রা বটুকদাদাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে বারণ করেছেন।

আমরা একটা ঘরে বসে ক্যারাম খেলছি, হঠাৎ বকু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, কেষ্ট ফিরে এসেছে। কেষ্ট তেঁতুল গাছটার ডালে বসেছে।

আমরা খেলা বন্ধ করে বাইরে আসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই পাখির মুখে মানুষের ভাষা। তেঁতুল গাছের ডালে বসে সে ডাকছে বটুকদাদা , ওঠো ওঠো, ওঠো!

আমাদের চ্যাচামেচি শুনে বাড়ির অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এলো। আমরা বললুম, ঐ শোন, পাখি কথা বলছে!

ঠাকুমা এক গাল হেসে বললেন, ওটা নিশ্চয়ই একটা সবুজ রং করা ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখির ডাক এক এক সময় ঐরকম শোনায়। মন দিয়ে শুনে দেখবি, ঘুঘু যেন বলছে, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো......।

বটুকদাদা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে ডাকলেন, কেষ্ট, কেষ্ট।

অমনি পাখিটা তেঁতুল গাছ থেকে উড়ে এসে বসল বটুকদাদার কাঁধের ওপর।

আমরা কাছে গিয়ে বললুম , ও বটুকদাদা, তোমার কেষ্ট ঐ একটা কথা ছাড়া আর কোন কথা বলে না?



বটুকদাদা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস , ওরে কেষ্ট, কেষ্ট রে, তুই কেমন আছিস?

পাখিটা অমনি বলে উঠল, ভালো ভালো, ভালো।

বটুকদাদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে ঠিক মতন খাওয়া—দাওয়া হয়েছে তো? এই জায়গাটা কেমন লাগছে?

পাখিটাও আবার বলল, ভালো, ভালো, ভালো।

বটুকদাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলি? এর আগেও আমি কত পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছি। তোদের ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

সেবারে যে দু'তিন দিন বটুদাদা রইলেন, পাখিটাকে নিয়ে আমাদের খুব আনন্দে কাটল। এত পোষমানা পাখি আমরা আগে দেখিনি। তার একটুও ভয় ডর নেই। সে আমাদের পড়াশুনার সময় ঘরের মধ্যে চলে আসে, এক পাশে চুপ করে বসে যেন আমাদের পড়া শোনে।

ঠাকুমা বললেন, আহা রে, পাখিটা নিশ্চয়ই আগেব জন্মে মানুষ ছিল। তাই মানুষের পাশে পাশে থাকতে এত ভালবাসে।

আমরা কেষ্টর গায়ে হাত দিই না, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলি। সে বেশি কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের সব কথাই যেন সে বুঝতে পারে। অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তরে সে বলল, ভালো, ভালো, ভালো। কিংবা না, না, না। প্রশ্নগুলো সেইভাবে সাজাতে হয়। যেমন আমরা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি, কেষ্ট তোমায় কেউ কষ্ট দিয়েছে? অমনি সে বলে, না, না, না। কিংবা, কেষ্ট আজ কি বৃষ্টি হবে? সে বলবে, না, না, না।

তিনদিন বাদে বটুকদাদা যখন কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা নৌকোর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে বটুকদাদাকে বললুম, বটুকদাদা পরের বার যখন আসবে, তখন কেষ্টকে ঠিক সঙ্গে করে এনো কিন্তু!

বটুকদাদা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, হ্যাঁ আনবো। কি রে কেষ্ট, তুই আসবি না?

কেষ্ট এই কথার উত্তর দিল না, কারণ সে হ্যাঁ বলতে পারে না।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেষ্ট, তুমি অন্য জায়গায় থেকে যাবে না তো?

কেষ্ট তখন বলল, না, না, না।

বটুকদাদা ফিরে এলেন দেড় মাস বাদে। এবার তাঁর সঙ্গে রতন বলে একটা ছেলে এসেছে কিন্তু তাঁর কাঁধের ওপর পাখিটা নেই।

তা দেখে আমাদের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। কেষ্ট আসে নি। সে কি অন্য জায়গায় উড়ে চলে গেছে? বটুকদাদা একসময় বলেছিলেন যে আগেও তিনি অনেক পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু এক সময় তাদের আবার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, বটুকদাদা, কেষ্ট কোথায়? কেষ্টকে আনেনি?

বটুকদাদা বললেন, হ্যাঁ এসেছে। কেষ্ট আছে। পরে দেখতে পাবি। কিন্তু বটকদাদার সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই, কাঁধে শুধু একটা টাকা পয়সা রাখার ঝুলি, তার মধ্যে তো একটা পাখি রাখা যায় না। তা হলে কেষ্ট কোথায়? সে কি আকাশপথে আসছে?

বটুকদাদা বললেন, এবারে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, ওরে, দারুণ বিপদের মুখে পড়েছিলুম। দাঁড়া, একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর সব কথা শোনাবো।

দুপুরবেলা বটুকদাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও কেষ্টর পাত্তা নেই। আমরা

রতন নামে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই তুমি কেষ্টকে চেনো? তাকে দেখেছ? সে এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

রতন বলল, হ্যাঁ আমি কেষ্টকে চিনি। অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সে এখন কোথায় আছে তা তো বলতে পারব না?

বকু জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে এবারে বটুকদাদার সঙ্গে এলে, আসবার পথে তাকে একবারও দেখতে পাওনি?

রতন হঠাৎ মুখ চুন করে বলল, না গো, কি করে দেখব বলো, গত হপ্তায় যে তাকে একটা বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।

আমরা সব কটি ভাই বোন একসঙ্গে আঁতকে উঠে বললুম, অ্যাঁ? বেড়াল খেয়ে ফেলেছে? কেষ্টকে? যাঃ, তা হতেই পারে না।

রতন বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি গো। গত হপ্তায় আমাদের নৌকা বাঁধা হয়েছিল চাঁদপুরের ঘাটে। আমরা মুড়ি খেতে বসেছি, কেষ্ট পাশেই বসে আছে। হঠাৎ ঘাট থেকে একটা হুলো বেড়াল লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরলো কেষ্টকে। তারপর তো তাকে মুখে নিয়ে দিল একটা উল্টো দিকে লাফ। আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলুম বটে কিন্তু ততক্ষণে কেষ্ট মারা গেছে। পাখির প্রাণ কি বেড়ালের কামড়ে বাঁচে? বেড়ালটার মুখ থেকে কেষ্টর আধ খাওয়া দেহটা উদ্ধার করা হলো, তারপর ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলে। বটুকদাদা সেদিন খুব কেঁদেছিলেন।

ভীষণ দুঃখে আমরা সবাই চুপ করে গেলুম। শুধু বকু মিন মিন করে রতনকে জিজ্ঞেস করল, তবে যে তুমি প্রথমে বললে, কেষ্ট কোথায় আছে তা তুমি জানো না?

রতন এ প্রশ্নের কোন ও উত্তর দিল না।

বিকেলবেলা ঠাকুরর্দা—ঠাকুমা আর বাবা—কাকার আসরে চা—মুড়ি খেতে খেতে বটুকদাদা শোনালেন এবারে বিপদের গল্প। প্রত্যেকবারই তাঁর একটা না একটা গল্প থাকে। তবে এবারে নাকি তিনি নির্ঘাৎ প্রাণেই মারা যেতেন।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই পাখিটা কোথায় গেল? ছেলেরা বলছে, তাকে নাকি.......

ঠকুরমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বটুকদাদা বললেন, আগে এই ঘটনাটা শুনে নাও। তারপর কেষ্টর কথা বলব।

বটুকদাদা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে একটু সুন্দর—বনের

দিকে গিয়েছিলুম বুঝলে? ওদিকে একটা খেয়াঘাট ইজারা নেবার কথা হচ্ছিল। ওদিকে বড্ড বাঘের ভয়, তাই সন্ধ্যের পর নৌকা বেঁধে ফেলেছি। রাত্তিরে আর রান্না বান্নার ঝামেলা করিনি, কাছেই একটা হোটেল ছিল সেখান থেকে খেয়ে নিলুম রতন আর আমি। রতনটা খুব ঘুম—কাতুরে, সন্ধ্যে হতে না হতেই ওর ঘুম পায়। আমিও আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লুম, শুধু কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কি। পাশাপাশি তিন চার খানা নৌকো ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ এক সময় আমার কানের কাছে কেষ্ট ডেকে উঠল, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

সেই ডাক শুনে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। অমনি কানে এলো হৈ হৈ শব্দ; ছই—এর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি পাশের নৌকাতেই ডাকাত পড়েছে। মশালের আলোয় চোখে পড়ল, একজন ডাকাত একজন মাঝিকে মারার জন্য খাঁড়া তুলেছে।

বুঝলে দাদা, এক মিনিট দেরি হলে সেই ডাকতরা আমার নৌকাতেও লাফিয়ে চলে আসত। কেষ্ট ঠিক সময় আমার ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে প্রাণে মারা যেতুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে নৌকার দড়ি খুলে নিয়ে একটা ধাক্কা মারতেই আমাদের নৌকো ভেসে পড়লো স্রোতে। ডাকাতরা আর ধরতে পারলো না।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কবেকার ঘটনা?

বটুকদাদা বললেন, এই তো পরশু রাতেই......তারপরেই সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে।

ঠাকুমা বললেন, পরশু রাতে? তাহলে যে ছেলেরা বলল, এক সপ্তাহ আগেই নাকি তোমার কেষ্টপাখিকে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে। সে পাখিটা তো মরে গেছে?

ঠাকুমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বটুকদাদা বললেন, মরে গেলেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? কেউ কেউ থাকে। কেষ্ট হারিয়ে যায়নি, সে এখনও আছে। সেই আমায় বাঁচিয়েছে।

ঠাকুমা কপালে দু'হাতে ঠেকিয়ে বললেন, রাম, রাম!

গল্পটা শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ছোড়দি বলল, হয় ঐ রতনটা মিথ্যে কথা বলেছে, না হলে বটুকদাদা এই গল্পটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পেলুম একটা পাখির গলার ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!



কেষ্টকে আমি খুব ভাল বাসতুম, কিন্তু ঐ ডাক শুনে আমার দারুণ ভয় হলো। আমি পাশের ঘুমন্ত ছোড়দিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে বললুম, ছোড়দি , ছোড়দি, শোন.......

ছোড়দি কান খাড়া করে শুনল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, মানুষ মরে গেলে কখনো ভূত হয় শুনেছি, পাখি মরে গেলেও ভূত হয়? ধ্যাৎ! যত সব বাজে কথা। চল তো গিয়ে দেখি!

ছোড়দির খুব সাহস, সে আমায় হাত ধরে নিয়ে এলো ঘরের বাইরে। ডাকটা আসছে পুকুর ধারের তেঁতুল গাছটা থেকে। আমরা দুজনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালুম। কোনও পাখি চোখে দেখা গেল না। পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বটুকদাদা। চোখ মুছতে মুছতে আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, ঐ যে কেষ্ট আমাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস? আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে তো, তাই কেষ্ট ডেকে তুলছে।

এবারে ছোড়দিও কোনও কথা বলতে পারল না।

রাত যখন বারোটা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



গণেশবাবুর ভারি দয়ার শরীর। তিনি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন, অভাবী মানুষকে সাহায্য করেন, কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করেন, গরিব ছাত্রের স্কুলের বেতন বা পরীক্ষার ফি দিতে কাতর হন না, পাড়ার ক্লাবে পুজোর চাঁদা দেন মুক্ত-হস্তে। শুধু তাই নয়, তিনি সকালে উঠে নিজের হাতে কাক-পক্ষীদের ডাকাডাকি করে আটার নাড়ু আর দানা খাওয়ান, রাস্তার কুকুরদের দেন মাছের কাঁটা মেশানো ভাত, বেড়ালকে ভুক্তাবশেষ দুধ। কত আর বলা যাবে, বললে শেষ হয় না।

সারাদিন গণেশবাবুর নানা কাজ থাকে। বিরাট তাঁর ব্যবসা, মস্ত ফলাও কারবার। বেশ একটু রাত করেই ফেরেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ বুকডন বৈঠকি দিয়ে একটু ব্যায়াম করেন। তারপর পোষা বাঁদরকে কলা খাওয়ান, স্নান করেন, চাট্টি খান। রাত বারোটায় যখন শুতে যান, তখন তাঁর বুড়ি পিসির ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙার দোষও নেই নব্বুই বছরের পিসি সেই সাঁঝবেলা থেকেই ঘুমোন। রাত বারোটায় তাঁর ঘুম হয়ে যায়। তখন ডাকাডাকি করতে

থাকেন, 'বলি ও গণশা, এয়েছিস?'



'এয়েছি পিসি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো ।

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গণশা, এয়েছিস?'

'এসেছি পিসি'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'বলি ও গণশা, এয়েছিস?'

এরকম কিছুক্ষণ চলার পর বুড়ি দাসী দামুর মা উঠে ধমক দেয়, 'বলি হচ্ছেটা কী গো দিদি, এক কথা ক'বার জিজ্ঞেস করতে হয়? বাবু এয়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। এবার তুমি ঘুমোও তো। '

'ঘুম কি আর আসে রে বাছা, যা শীত পড়েছে এবারে। হাড় কালি হয়ে গেল।'

'তোমার মাথাটাই গেছে দিদি। জষ্টির গরমে আমরা হাঁফাচ্ছি, আর ওঁর এখন শীত লাগতে লেগেছে।'

'গিরিষ্মি নাকি? তাই বল, জষ্টি মাস! আমি কি আর অতশত বুঝতে পারি বাছা? তা কথা তো একই। গিরিষ্মিতেও কষ্ট,শীতেও কষ্ট। তা যা হোক একটা দে। হয় লেপ, না হয় হাত পাখা। কিসের যে কষ্ট বুঝতে পারি না। তা সেবার বটঠাকুর গিরিষ্মিকালে যা একখানা কাঁটাল এনেছিল না ষষ্ঠীতলা থেকে.....'

দামুর মা উঠে পান আর দোক্তা মুখে দিয়ে ঝাঁটাগাছ তুলে নিয়ে বলে, 'ঘুমের তো দফা রফা করলে, তা আমিও তা হলে বেহানবেলায় কাজ মাঝ-রাত্তিরেই সেরে রাখি। ঝাঁটপাট দিয়ে ফেলি এই বেলা।'

গণেশবাবুর ছেলে গোবিন্দ এমনিতে শান্তশিষ্ট, তবে তার মাথাটা বড্ড গবেট। ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ উঠতে তার বছর-পাঁচেক লেগেছিল। তবে সে বড় ধৈর্যশীল ছেলে। দিনরাত পড়ে। সেই পড়ায় পাড়া মাত। দুঃখের

বিষয়, পড়াটা তার মাথায় ঢুকতে চায় না, ঢুকলেও থাকতে চায় না।

রাতের পড়া শেষ করে গোবিন্দ ঘুমোচ্ছে। দামুর মা'র ঝাঁটার শব্দে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। ঝাঁটার শব্দ মানেই ভোর। আর ভোর মানেই পড়া। গোবিন্দ গ্রামার খুলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

এক্রাম আলির মুর্গিরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। ঝাঁটার শব্দে তারা সচকিত হয়েছিল, গোবিন্দ'র পড়ার শব্দে তারা ভোর হয়েছে ভেবে কোঁকোর-কো' বলে সমস্বরে ডেকে উঠল।

এক্রাম আলির বাড়ির উলটো দিকে থাকেন ভদ্রেশ্বরবাবু। মুর্গির শব্দে ঘুম ভাঙতেই ভদ্রেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ছড়ি গাছ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রাতঃভ্রমণে। কানাইবাবুকেও সঙ্গে ডেকে নেন।

তা প্রায় রোজই এরকম হয়। গণেশবাবু ফেরেন। বুড়ি পিসির ঘুম ভাঙে। দামুর মা ঝাঁটপাট শুরু করে। গোবিন্দ পড়তে লাগে। এক্রাম আলির মুর্গি ডাকে। ভদ্রেশ্বরবাবু আর কানাইবাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

আর এসব কাণ্ড যখন ঘটতে থাকে, তখন চুপিচুপি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা লোক রোজ গণেশবাবুর বাড়ির পাছদুয়ার থেকে গুটি গুটি ফিরে যায়। লোকটা আর কেউ নয়, চারু চোর।

লোকে বলে চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। মদন আর চারু হল তাই। দু'জনেই দু'জনের মাসতুতো ভাই, দু'জনেই চোর। দু'জনের ভাবও খুব। চারুর বিরস মুখ মদন রোজই জিজ্ঞেস করে, 'আজও পারলি না?'

চারু মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, 'না।'

মদন চিন্তিত মুখে বলে, 'তবে তো ভারী মুশকিল হল।'

মুশকিলই বটে। আসলে দু'জনেই ছিঁচকে চোর। চোরের মহলে তাদের কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। তবে তল্লাটে কালু দাসের একটা চোর তৈরির ইস্কুল আছে। চোরের ইস্কুল বলতে ব্যাপারটা ফেলনা নয়। কালুর সেই ইস্কুল থেকে যারা পাশ-মার্ক পেয়ে যায়, তারা হিল্লি-দিল্লি গিয়ে নাম করে ফেলে। সেই ইস্কুলে ভর্তি হওয়া ভারী শক্ত। বহু হবু চোর প্রতিবার অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। মদন আর চারু গত দু'বছর ধরে চেষ্টা করে পেরে ওঠেনি। এবারও কালুর হুকুম হয়েছে, মদনকে মল্লিকবাড়ি থেকে আর চারুকে গণেশবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করে এলেম দেখাতে হবে, তবে ভর্তি।

হাড়কিপটে গগন মল্লিকের বাড়িতে চুরি করাটাও শক্ত কাজ ছিল। তবে

মদনের কপাল ভাল। গগন মল্লিকের সওয়া শো বছর বয়সী ঠাকুমা হঠাৎ পট করে মরে যাওয়ায় বাড়িতে তেমন পাহারা ছিল না। মদন সেই ডামাডোলে ঘরে ঢুকে চুরি করে পালায়।

কিন্তু ফেঁসে গেছে চারু।

মদন বলল, 'উপায় তো একটা করতেই হচ্ছে। দু'ভাই একসঙ্গে কালুর ইস্কুলে চুরি শিখতে না পারলে আর মজাটা কী? ঠিক আছে, আজ রাতে আমিও তোর সঙ্গে থাকব। তবে কথাটা কালু জানতে পারলে দু'জনকেই বাদ দিয়ে দেবে।'

তো তাই ঠিক হল।

গণেশবাবু বাড়ি ফিরেছেন। ব্যায়াম করেছেন। বাঁদরকে কলা দান করেছেন। চাট্টি খেয়েছেন। পান মুখে দিয়ে হাই তুলেছেন।

ওদিকে পিসিরও ঘুম ভেঙেছে।



'বলি ও গণশা, এয়েছিস?'

'এসেছি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গণশা, এয়েছিস?'

'এসেছি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ওগণশা, এয়েছিস?'

এ-রকম চলতে চলতেই দামুর মা উঠে পড়ল। শীত-গ্রীষ্ম নিয়ে কথা হল। তারপর দামুর মা রাগ করে ঝাঁটপাট শুরু করে দিল। গোবিন্দ উঠে পড়তে বসে গেল। এক্রাম আলির মুর্গি ডাকতে লাগল। ভদ্রেশ্বরবাবু বেরিয়ে কানাইবাবুকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, 'বলি ও কানাইবাবু, আর দেরি করলে যে বেলা হয়ে যাবে, সুয্যি যে উঠে পড়ল বলে।'

গোটা পাড়াটাই বলতে গেলে মাঝরাত্তিরে জেগে উঠল।

এই অবস্থায় চুরি করা বা পালানো দুই-ই বিপজ্জনক। মদন এবং চারু শুনতে পেল, এ-বাড়ির লোক ও-বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছে। গণেশবাবুর পিসির যে আক্কেল নেই, দামুর মা যে একটি উজবুক, গোবিন্দ যে একখানা পাঁঠা, এক্রামের মুর্গিগুলো যে মানুষ নয়,ভদ্রেশ্বর আর কানাইয়ের যে কোনওকালে বুদ্ধি হবে না এসব আলোচনার পর তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের নানা কথা বলাবলি করতে লাগল।

মদন আর চারু দু'জনেই জোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরস্পরের দিকে তাকাল। চারু মাথা নেড়ে বলল, 'উপায় নেই মদনদা, এ-বছর তুমিই ভর্তি হও কালুর ইস্কুলে।'

মদন চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর তো।'

ওদিকে গণেশবাবু পান চিবিয়ে পাশবালিশ আঁকড়ে সদ্য ঘুমের আবেশে চোখ বুজেছেন, এমন সময় জানলার বাইরে থেকে কে যেন মোলায়েম গলায় বলল, 'গণেশবাবু, ঘুমোলেন নাকি?'

গণেশবাবু ভারী অমায়িক মানুষ। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, 'আজ্ঞে না, একটু ঘুমোব-ঘুমোব ভাবছিলাম আর কি।'

'কিন্তু আপনার কি ঘুমোনটা উচিত হবে গণেশবাবু? সারা পাড়া জাগিয়ে রেখে আপনার ঘুমিয়ে পড়াটা কি ভাল কাজ?'

গণেশবাবু ব্যাপারটা বোঝেন। মাথা চুলকে লাজুক গলায় বললেন, 'আজ্ঞে, তা অবশ্য ঠিক। আমার পিসি, আমার দাসী, আমার ছেলে, এক্রামের মুর্গি, ভদ্রেশ্বর আর কানাই মিলে রোজ রাতে একটা ভজঘট পাকায় বটে, কিন্তু তার জন্য আমি কী করতে পারি বলুন। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে? এদিকে তো কখনও দেখিনি মশাইকে।'

মদন একটু কেঠো গলা সাফ করে নিয়ে বলল, 'যদি অভয় দেন তো বলি, আমরা দু'জনেই চোর।'

'বটে! বটে!'

'গত সাতদিন ধরে আমার ভাই এই চারু এসে ঘুরে যাচ্ছে, একদিনও চুরি করতে পারেনি। না পারলে কালুর ইস্কুলে এবারেও ওকে নেবে না। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছেন? আপনার দয়ার শরীর, কাক-কুকুর-ভিখিরি কাউকে ফেরান না, আমার এই ভাইটিকে কি আর ফেরাবেন?'

গণেশবাবু একটু হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একটু ভাবতেই তাঁর মাথা পরিস্কার হয়ে গেল। তিনি হেঁকে উঠলেন, 'বটেই তো, আমার বাড়িতে একটু চুরি করবেন সে তা আমার সৌভাগ্য। দাঁড়ান, এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বলে গণেশবাবু গর্জন করতে করতে গিয়ে গোবিন্দকে বিছানায় পাঠালেন। দামুর মা'কে ধমকে গোয়ালে গিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পিসির ঘরে শিকল তুলে দিলেন। তারপর সদর খুলে একগাল হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন।'

এরপর আর চুরির কোনও বাধা রইল না।

তবে আমরা খবর পেয়েছি, চারু এবারেও কালুর ইস্কুলে ভর্তি হয়নি। সে চুরি ছেড়ে পানের দোকান দিয়েছে।



শীতের রাতে

উজ্জ্বলকুমার দাস



ট্রেনটা যখন সালারডি স্টেশনে থামল, সন্ধ্যে তখন প্রায় ছ'টা। একেই শীতকাল, তাই সুয্যিমামা অনেক আগেই ডুব দিয়েছেন পশ্চিমে। আধো ছায়া ছায়া নুড়িবিছানো প্ল্যাটফর্মটিকে বেশ লাগছিল। এখানে গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।

ট্রেন থেকে নামলাম। হাতে একটা সুটকেস্ নিয়ে এগিয়ে গেলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন নেই। যে দু-চারজন যাত্রী নামল, তাদের আর দেখতে পেলাম না। হয়ত তারা কাছাকাছি থাকে, তাই লাইন টপ্‌কে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে।

স্টেশন মাস্টারকে পেলাম না। বুকিং কাউন্টারে একজন বসে। সেও ডিউটি শেষ হবার অপেক্ষায়। একটু দূরে একজন কুলি বসে চাদরমুড়ি দিয়ে। আমি বুকিং কাউন্টারের ভদ্রলোকটিকে জিঞ্জেস করলাম, 'এখন কোন বাস পাওয়া যাবে সাঁওতালডিহ্ যাবার?'

ভদ্রলোকটি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'না। তবে কারখানার কোনও গাড়ি যদি এসে যায় তবে হয়ত যেতে পারবেন।'

আমি আর কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক আমার ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বললেন,'তবে পাশে দেখুন, একটা যাত্রীদের ঘর আছে। নামমাত্র 'ওয়েটিং রুম।' খুব একটা প্রয়োজন হয় না বলে, ওটার আর সংস্কার হয় না। মশাই, ধুলোয় ভরা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম,'রাতে কী স্টেশন ফাঁকাই পড়ে থাকে?'

তা কেন? কুলি থাকবে, স্টেশনমাস্টার থাকবেন। তেমন প্রয়োজন হলে মাস্টারমশাইকে বলে কাউকে পাঠিয়ে চা-টা আনিয়ে দিতে পারবেন।'

চা-এর নামটা শুনে খুশিই হলাম। 'তা, আপনার ডিউটি কখন শেষ, হবে?'

'আটটায়।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা ঘুপচি ওয়েটিং রুমটায় গিয়ে ঢুকলাম। পকেটের রুমাল নেড়ে ধুলো উড়িয়ে বসলাম।

ক্রমে সন্ধ্যে নেমে এল। বুকিং কাউন্টারটা অন্ধকার। একমাত্র স্টেশন-মাস্টারের ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলল। বুঝলাম রাতে পরের স্টেশন মাস্টার আসবেন। কুলিরা কাছে পিঠে নেই। জমাট কুয়াশা নেমে এল স্টেশনটাকে গ্রাস করতে।

আমি একা বসে ওয়েটিংরুমে। সঙ্গে কেউ নেই যে দু-চারটে কথা বলবো। সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বালালাম। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নানারকম কথা ভাবতে লাগলাম। কী দুর্ভোগ! ট্রেন আসতে দেরি হল বলে এত ঝঞ্ঝাট। যাক, আর ভেবে কী লাভ!

বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকল। এখন বেশ শীত শীত করছিল। সুটকেস্ খুলে একটা চাদর বের করতে যাব এমন সময় কে যেন বলে উঠল', 'কী ঠান্ডা বলুন? তা মশায়ের কী কলকাতা থেকে আগমন?'

চমকে উঠলাম আমি। কেউ ছিল না, অথচ এ কণ্ঠস্বর কার? পাশে তো কেউ ছিল না? সত্যি আমি ছাড়া তো কেউ ছিল না এখানে? তবে কি মনের

ভুল! ভাবতে পারছি না।

আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে আবার সেই কণ্ঠস্বর। 'মশাই, জবাব পেলাম না যে!'

আমি দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন দিতে যাবো, তখনই চোখে পড়ল আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা ভদ্রলোককে। যাক্ বাবা! একজন সঙ্গী পাওয়া গেল তাহলে!

'আচ্ছা মশাই, এখান থেকে যাবেন কোথায়?'

'সাঁওতালডিহ্।'

'হ্যাঁ, নতুন টাউনশিপ্। বেশ জায়গা। তবে এখন ওখানে লোকজন খুব একটা নেই।'

'ঠিক তাই, তা কী করব বলুন। একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার, তাই এতদূর পথ ঠেঙ্গিয়ে আসা।'

'তা এত দেরি কেন? নিশ্চয়ই ট্রেন লেট্? গোমো প্যাসেঞ্জারটা বড্ড দেরি করে আসে। সময়ের ঠিক-ঠিকানা নেই।

'আপনি যাবেন কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'যাব তো অনেকদূর। কিন্তু রাতে গাড়ি পাবো না বলেই ঢুকে পড়লাম এখানে। কোনও রকমে রাতটা কাটলেই বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে।'

'বাড়ি কতদূর?'

'বাড়ি? বাড়ি এখানে নয়। আপনার মত আমাকেও যেতে হবে এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর অসুস্থতার খবর পেয়েছি যখন তখন বলুন, না আসা যায়?'

'সত্যি তো। মানবিকতা বলে একটা কথা আছে তো?'

'আজকাল তো মশাই এই শব্দটা বেমানান। এখন যার যা তার তা। আন্তরিকতাটা ক্রমে উঠে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোককে বেশ জমাটিলোক মনে হল। কথাবার্তা বেশ সরস।

তারপর কিছুক্ষণ আমরা দু'জনে চুপ। বাইরে মনে হল বৃষ্টি পড়ছিল। উঠে গিয়ে দেখলাম অনুমানটা ঠিক। আবার যেই বসতে যাব, হঠাৎ লোকটি কঁকিয়ে উঠলেন,'উহ্ মশাই, একটু দেখে বসুন।'

'দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। দেখতে পাইনি।' আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আসলে কী জানেন, আমার ডান পায়টায় বড্ড



ব্যথা। কী যে হয়েছে, বুঝতে পারি না।'

'ডাক্তার দেখাননি?'

'ডাক্তার? গাঁয়ের ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। ওদের আর ক্ষমতা কতটুকু? তারপর কী জ্বর জানেন? উল্টে পায়ের আঙুলগুলো কাটতে হল। এখনো মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।'

'শহরে যাননি কেন?'

'শহরে গিয়ে দেখানোর পয়সা ছিল না। তারপর যেদিন মশাই কিছু পয়সার মুখ দেখলাম তখন ভোগ করার সময় পেলাম না।'

'মানে?'

'মানে, বুঝতে পারলেন না? সংসার গেল বেড়ে, ভোগের লিপ্সা গেল কমে।'

'আচ্ছা মশাই একটা কথার জবাব দেবেন?'

'কি বলুন?' আমি বললাম।

'আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেলাম। এ আবার কী প্রশ্ন রে বাপ। বেশ কথা হচ্ছিল হঠাৎ এ আবার কী কথা।

'কই ,জবাব দিলেন না যে?'

'না। বিশ্বাস করি না।' আমি জবাব দিলাম।

'মশাই, আমিও বিশ্বাস করতাম না; কিন্তু একদিন আমাকে বিশ্বাস করতে হল। সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা।'

'বলুন না। শুনি। সময় কেটে যাবে। আচ্ছা একটু চা হলে ভালো জমত বলুন?'



'চা খাবেন? দাঁড়ান আনছি।'

'কাছে দোকান আছে নাকি?'

'থাকবে না কেন? স্টেশন সামনে, চা থাকবে বৈ কি।

'শীতের রাত, রাস্তাঘাট ফাঁকা, চা পাওয়া যাবে?'

কথাটা বলতেই কোন উত্তর পেলাম না। ভদ্রলোক বোধহয় বেরিয়ে গেছেন। কী আর করা যাবে। চুপচাপ বসে রইলাম।

এত তাড়াতাড়ি চা পাব ভাবতেই পারলাম না। কোথা থেকে চা নিয়ে এল, কে জানে! চা নিয়ে কথা বাড়ালাম না। শীতের রাতে গরম চা খেতে মন্দ লাগল না।

আমিই স্তব্ধতা ভেঙ্গে বললাম, 'কই, ভূতের ব্যাপারটা কি হল?'

'শুনবেন সেই অভিজ্ঞতার কথা?'

'শুনব।'

' আর একটা সিগারেট দিন। সত্যি মশাই, ঠান্ডায় এই একটা জিনিসই টানতে বেশ লাগে।'

আমি সিগারেট দিলাম। ভদ্রলোক সিগারেট টানতে লাগলেন। অন্ধকারে শুধু সিগারেটের লাল আগনটুকুই দেখা গেল।

'জানেন মশাই,---সেদিনটা ছিল বর্ষার একটা দিন। হুগলির এক গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম বন্ধুর অসুস্থতার খবর পেয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়ায়। ওখান থেকে ট্রেনে চেপে রওনা দিলাম আগ্রার উদ্দেশ্যে। বিকেলের পর পৌছলাম আগ্রায়।

সেখান থেকে রিক্সা নেব বলে স্ট্যান্ডে গেছি, দেখলাম সেদিন রিক্সা চলা



বন্ধ। কারণটা কি কেউ বলতে পারল না। অগত্যা হাঁটা পথেই এগোতে লাগলাম। মাঝে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে চা বিস্কুট খেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে করে হাঁটতে লাগলাম।

সন্ধ্যেনেমে এল পথে। চারপাশটা ফাঁকা। একটা লোককেও পথে দেখলাম না। যাচ্ছি তো যাচ্ছি। অন্ধকার ছেয়ে ফেলল মেঠো পথটাকে।

হঠাৎ দেখলাম সামনে দিয়ে একটা লোক হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে বললাম আমার গন্তব্যস্থান।

লোকটি বলল, আসুন আমার সঙ্গে। তবে মশাই আমি কিন্তু যাব না আপনার সঙ্গে। কারণ আপনার পথ একদিকে আর আমার পথ অন্যদিকে। তেরাস্তার মোড়ে একটা বটগাছ আছে। ওটাই নিশানা।

বটগাছের কাছে আসতেই লোকটা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর একটা কথা বলে গেল, পথটা ভালো নয়, সাবধানে যাবেন।

আমি বলতে যাব, দেখি লোকটা নিমেষে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে।

আমার গা-টা ছম্‌ছম করতে লাগল। একরকম জেদ্ চেপে গেল। যে করেই হোক, পৌঁছতেই হবে।

যাচ্ছি তো যাচ্ছি। চারদিকে অন্ধকারের মাঝে দেখতে পেলাম একটা বাড়ি। কাছে যেতেই দেখি ঠিকানাটা ঠিক।

যাক্, তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি। দরজায় ধাক্কা দিতে যাবো এমন সময় কে যেন ভেতর থেকে বলল, 'আসুন, দরজা খোলা আছে।'

ভেতরে ঢুকলাম। একজন মহিলা বললেন, 'বসুন'।

একটা মোড়াতে বসলাম। মহিলাটি চলে গেলেন। বন্ধু কোথায় তবে। ভাবছি, এমন সময় দেখি বয়স্ক এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম, গালের হাড়গুলো স্পষ্ট, চোখগুলো কালো গর্তে জ্বলজ্বল করছে। আমি জিজ্ঞস করলাম, 'আচ্ছা নিতাই কেমন আছে?'

ভদ্রলোক মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলেন, 'একটু ভালো। তোমার নাম কি ললিত?'

'হ্যাঁ, নিতাই কোন ঘরে আছে?'

'ওর কথা বলো না, একটু সুস্থ হয়েছে কী অমনি বেরিয়ে পড়েছে।'

'কোথায় গেছে?'

'আজ হয়ত ফিরতে পারবে না। তবে কাল সকালে ফিরবেই। তোমার কোনও কষ্ট হবে না। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বে। সকালেই দেখতে পাবে নিতাইকে।'

ভদ্রলোকের কী পরিচয় এখনো জানতেই পারলাম না।

হয়ত নিতাইয়ের কেউ হবে। আমি আর সেটা জিজ্ঞেস করলাম না।

রাতের খাবার দিতে এসেছিল মহিলাটি। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমে ঢলে পড়লাম বুঝতেই পারলাম না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখলাম জানালা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসছিল। উঠে জানালাটা বন্ধ করতেই দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে। বেশ ভয় পেলাম। চেঁচিয়েই বললাম, 'কে, কে ওখানে?'

'আমি নিতাই রে ললিত।'

'তুই, শুনলাম তুই সকালে ফিরবি?'

'দূর বোকা। তুই এসেছিস, তখন আর না আসতে পারি? তা এখানে যখন এসেছিস, থেকে যা ক'টা দিন।'

'নারে, তুই যখন একটু ভালো হয়েছিস, ভাবছি কালকেই ফিরে যাব।'

'কিন্তু, ললিত আমি তোকে ছাড়লে কী হবে এরা তোকে ছাড়বে না।

খারাপ জায়গায় এসেছিস। আর আমার সেই শক্তি নেই যে তোকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলব্।'

'কেন,.........তুই কি তবে................

নিতাই লম্বা হতে লাগল। এত লম্বা হতে লাগল যে ঘরের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে ওর মাথা। আমি ছুটে পালাতে যাবো দেখি বয়স্কলোকটা আর সেই মহিলা দাঁড়িয়ে, ঘরের মধ্যে গরম হাওয়া। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'ছেড়ে দে নিতাই। আমাকে বিপদে, ফেলে তোর কী লাভ?'

নিতাই নেই ঘরে। দুটো ছায়ামূর্তি আমাকে জাপটে ধরল। যেন অজগরের প্যাঁচ। দম নিতে পারছিলাম না। তারপর.....................।

'তারপর কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

কোনও উত্তর নেই। দেশলাই জ্বেলে দেখি কেউ নেই। শীতের রাতে গায়ে ঘাম জমল। নিমেষে কপুর্রের মত উবে গেল আমার সঙ্গীটি।

ছুটে বেরিয়ে গেলাম। একজন কুলিকে কাছে পেলাম। সেও আমল দিল না আমাকে। আবার ছুটে গেলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরে। সেখানেও কেউ নেই, লন্ঠন জ্বলছে। এ কী ঘটল।

প্ল্যাটফর্মে চলে এলাম। দেখি এখানেও রেল লাইন নেই। পেছন ফিরে দেখলাম ধূ-ধূ ফাঁকা জায়গা।

প্রাণ ভয়ে দৌড় লাগালাম। কতক্ষণ দৌড়েছি জানিনা, সকাল হতে দেখলাম কলকাতার বাড়িতে।

